চিত্ত সিংহ

সুধন্য ও সেবারের বর্ষা

সৃজনী
৪ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬৫

প্রকাশক : অসীম রায়
সৃজনী , ৪, ভূপেন বোস এভিন্যু—৪

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন—৬

চিত্ত সিংহের পরবর্তী গ্রন্থ :

উপন্যাস : বারোমাস্যা/শিকড়

কাব্যগ্রন্থ : রাজেশ্বরী/ক্রীতদাস

রচনা : স্ব-নির্বাচিত রচনা/২

চিত্র : স্ব-নির্বাচিত চিত্র/২

Selected Paintings/2

ছোটদের : আব্দুর বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু ॥

গল্প সূচী :

আমার বিচিত্র রচনা সমূহের মধ্যে আমার ছোট গল্প সম্পর্কে আমার পক্ষপাত মাতৃ-সুলভ নয়, পিতৃ-সুলভ ; এবং আমার জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা এ গল্পগুলোতে আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত।

'এই-ই নিয়তি!'—সংসারের সীমায় এই উচ্চারণে যে অমোঘতা, যে অনিবার্যতা, আমার গল্প সমষ্টিতে তার বিস্ময়কর উপস্থিতি আমার বিশ্বাসের-ই প্রতিবিম্ব। এবং অন্যে মানুক চাই না-মানুক, মানুষের সমস্ত কর্মের পেছনে রিপু ও প্রবৃত্তির চাইতে আরো প্রচণ্ড শক্তি সক্রিয়, এই সিদ্ধান্তে আমি স্থির। সম্ভবতঃ প্রাত্যহিক জীবনে বহু উচ্চারিত 'ঈশ্বর' সেই প্রচণ্ড শক্তির-ই প্রতীক—যিনি যথার্থ মহৎ শিল্পীর মতো নিজের শিল্পকে সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুতেই আগ্রহী নন।

১০ জুন, ১৯৬৫

চিত্ত সিংহ ও

চিত্ত সিংহের ছোট গল্প প্রসঙ্গে

'সাম্প্রতিক কালে যে ক'জন তরুণ লেখক চিন্তা-ভাবনার নিজস্বতার জন্য প্রশংসা পাচ্ছেন, চিত্ত সিংহ তাঁদের একজন।'...

'নিষাদ' প্রসঙ্গে 'দেশ' ॥ ১০ মে ১৯৬৪

'চিত্ত সিংহের অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট প্রবীণ, লেখাও যথেষ্ট শাণিত।'...

'কলকাতার কুয়াশা' প্রসংগে 'দেশ' ॥ ২৮ জুলাই ১৯৬২

'...ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর যে-সকল গল্প পাঠকের চোখে পড়েছে, বিষয়ের দিক থেকে তার মধ্যে ছিলো গ্রাম-বাংলা এবং সেই দেশোদ্ভূত বিবিধ চরিত্রের সুখ-দুঃখ ও আশা-আশঙ্কার মধ্যে একটি সংহতি সন্ধানের সংকল্প। সেই সব গল্পের বিরল-মাধুর্য ও শ্রীমণ্ডিত সুষমা বর্তমান উপন্যাস 'জলবিম্বে' অনুপস্থিত।

'জলবিম্ব' শহরকেন্দ্রিক উপন্যাস'...

'জলবিম্ব' প্রসঙ্গে 'দেশ' ॥ ২০ জানুয়ারী ১৯৬২

'...কয়েকটি গল্প লিখেই তিনি ইতিমধ্যে খ্যাতি কিনেছেন। গল্পগুলোর সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর জিজ্ঞাসা। জীবন জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার সমাধান প্রয়াসে তিনি নিয়ত উন্মুখ। তাঁর আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য।'...

'জলবিম্ব' প্রসঙ্গে 'দর্পণ' ॥ ৩০ জুন ১৯৬১

উত্তর পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছে জোর। ঢল নামল নদীতে। স্রোতের টানে কাঠকুটো ভেসে এল। কেউ কেউ সে সুযোগে ধরল কিছু কিছু।
তা সবাই আশঙ্কা করেছিল এটুকুতে থামবে না। যা আশঙ্কা করেছিল তাই-ই হল। ঢল নামার দুদিনের দিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। নদীর জল পাড় ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাঠে। মাঠ ভাসল, গাঁ, হাট, বাজার সবই ভাসল। তবু ধারাপাতের ক্ষান্তি নেই। দিন-রাত্তির লেগেই রইল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি।
সরকারী বড় সড়কটা এক রাত্রে গাঁয়ের লোকে মিলে কেটে দিলে। উত্তরের জল কমল কিছু, দক্ষিণে তখন জলে জলময়। পূর্ণিমার ভরা কোটালে জল আরও বাড়ল। গাঁগুলো যেন একেকটা দ্বীপ; আর নদী কুলের ছাড়া ছাড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো যেন সার সার পাহাড়ের চুড়ো।
কাম-কাজ কিছুই নেই। সুদিনে দিন-মজুরী করে সুধন্য। এমন জল থৈ থৈ বর্ষায় ঠায় বসে কাটাতে হয়। এবারেও নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। উঠোনে জল উঠে এসেছে। এখন কাজ কোন চুলোয়। দাওয়ায় বসে ফুড়ুক ফুড়ুক তামাক টানা ছাড়া সুধন্য আর কিছুই করবার মত দেখলে না।
পাড়ার জোয়ানদের কেউ কেউ ডোবা পুকুরের ভেসে যাওয়া মাছ ধরার জন্যে তাক করেছে সরকারী সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে, কেউবা উঁচু জমির অল্প জলে পলো হাতে ছুটোছুটি করছে মাছের লোভে, আর কেউ কেউ এ সুযোগে নৌকো ভাড়া করে ভিন গাঁয়ে স্বজনদের দেখতে যাচ্ছে।
সুধন্যর মাছের লোভ নেই, আর থাকলেই বা কি। বৃষ্টিভেজা এমন দিনে মাছধরা তার ধাতে আসে না। তার চাইতে তামাক টানা ঢের ভালো। আর আত্মীয়স্বজন? ওই এক বউ উমা, আর মেয়ে রঙী। অবশ্য মেয়ের রঙ মোটেই ফরসা নয়, সুধন্যর মতোই কালো। মেয়ের নাম রঙী দিয়েছে সুধন্য; তার মতে রঙের রাজা কালো।
চোখ মেলে যদ্দুর দৃষ্টি চলে, থৈ থৈ জল, আর জল। জল দেখতে লাগল সুধন্য। এক সময়ে বউকেও ডাকলে। উমা রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলে—উঁ।
—শোন।

হাতের কাজ ফেলে উমা এল আঁচলে হাত মুছতে মুছতে।—কি গো, কি বলছ ?

ওই দেখ— দূরের দিকে হাত বাড়িয়ে চরণ বিলের মধ্যিখানের কোমর ডোবা বটগাছটাকে দেখিয়ে বললে—কেমন দেখাচ্ছে বল ত ?

উমা ফিক্ করে হেসে ফেললে,—মরণ! আমার ওদিকে মরার ফুরসুত নেই, উনুনে কড়া চাপিয়েছি, উনি গাছ দেখাচ্ছেন! তুমিই দেখো।

মুখ ঘুরিয়ে উমা চলে গেল। যেতে যেতে ভাবলে, আহা! অভাবে পড়ে মজুর খাটছে গো, নইলে কবিয়াল হতে পারত।

মেয়ে রঙী এতক্ষণ উনুনের পাশে বসেছিল। মাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরল। জিজ্ঞেস করলে—কি বাবা ?

উই যে--সুধন্য আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করলে।

—দৈত্যি। না বাবা ?

হুঁ।—মেয়ের মাথা নেড়ে চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিলে সুধন্য।

ভীষণ আদুরে মেয়ে। কাছছাড়া করতে চায় না এক পলকও। সুধন্যরও তাই। কাজ করতে করতে বার বার মনে পড়ে মেয়েটার কথা।

উমাকেও মনে পড়ে ভিন গাঁয়ে কাজ করতে গেলে। মনে পড়ে, যখন খেতে বসে। আর মনে পড়ে, রাত্তিরে যখন একা একা কর্তাদের বার বাড়িতে শুয়ে থাকে; তখন।

জলে টান পড়তেই সুধন্য কাজ পেয়ে গেল। এ কাজ পেত না, হঠাৎ পেল। বাবুদের বাড়ীর ছোট বউয়ের বাপের অসুখ। যাওয়ার সুবিধে আছে, তাই ছোট বউ বাপকে একবার দেখে আসবে। নৌকোয় করে বউমাকে পেঁছে দিতে হবে বাপের বাড়ি।

আসা-যাওয়া পুরো দিনের ধাক্কা। সুধন্য রাজী হয়ে গেল। তিন টাকা মজুরী, আর একবেলা ভরপেট খাওয়া। কম কি ?

সুধন্য ভোর উঠেই চলে গেল।

বড় বাড়ীর বড় চাল। বউমা এই বেরোল, এই বেরোল বলে ঝাড়া কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। তবু বউমা বেরোতে পারলে না। এটা হয় তো ওটা হয় না, ওটা হয় ত আরেকটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। অতএব নাও নাও।

শেষে বউমা বেরোল। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ, ছোটবাবু আর তাঁদের

মেয়ে।

জলে টান পড়লেও বৃষ্টি থামে নি। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি কখনো অঝোরে, কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি; লেগেই রইল। টোকা-মাথায় হালে বসল সুধন্য, আর বাবুদের রাখাল ছোঁড়া বংশী বসল দাঁড়ে।

ছই-এর নীচে বাখারির চাটাই-এর উপরে শতরঞ্জি পেতে ছোট বউদের জন্য জায়গা করা হয়েছে। প্রথমে উঠল সুটকেস, তার পিছু পিছু ছোট বউ, ছোট বউয়ের মেয়ে, সবশেষে উঠলেন ছোটবাবু।

বড়বাবু হাঁক পাড়লেন,—সাবধানে চালাস সুধন্য। বাদলার দিন, দেখে-শুনে, হুঁসিয়ার।

গলুয়ে চেপে বসে দাঁড়ের ধাক্কায় নৌকোটাকে ঠেলে দিলে সুধন্য।

নৌকো গতি নিতেই মনে মনে ভাবল সে, কদ্দিন থাকবে কে জানে? জল থাকতে থাকতে যদি ফেরে আরো একদিনের কাজ হবে। তিন টাকা মজুরী, ভবপেট একবেলা ভাত।

পেঁছুতে পেঁছুতে বেলা ঢলল।

বংশী কোন কাজের নয়। দাঁড় টানছে মড়ার মতো। আলতো হাতে যেন মাছের তরকারিতে হাতা ডোবাচ্ছে। ধমক-ধামকেও কাজ হল না।

উত্তরের খাল আর পশ্চিমের খাল যেখানে নদীতে মিশেছে, সেখানে সে কি জলের তোড়। এ-ধারা ও-ধারা মিলে সৃষ্টি হয়েছে পাকের। যেন কুমোরের চাক। ঘুরছে আর ঘুরছে। পশ্চিম খালের মুখের বড় হিজল গাছটাকে ঘিরে যেখানে বেত-বন, বেত-বনের গা ঘেঁষে বড় কাটা মাদারের ধার দিয়ে নৌকো আনতে গিয়ে সে কি অবস্থা সুধন্যর। যেমন পাক, তেমনি টান। ডাইনে হালে চাপ দিয়েছে কি পলকে নৌকোর মাথা বাঁয়ে ঘুরে গেল। সুধন্য চীৎকার করে বংশীকে বললে—দেখছিস কি, টান জোরে। আর টেনেছে! শেষ পর্যন্ত ছোটবাবুকে ছুটে গিয়ে দাঁড় ধরতে হল বউ মেয়েকে ছেড়ে। এদিকে মেয়েটার সে কি কান্না। বউটাও তেমনি। বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। কোথায় মেয়েকে সামলাবে তা না, ওদিকে উনিই বেসামাল।

সুধন্যর ততক্ষণে হাঁফ ধরেছে। আর একটু হলেই হিজলের গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে নৌকো ডুবছিল আর কি, সুধন্য হাল ফেলে গাছের ডাল ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিলে যে, নৌকো পাশ কাটিয়ে পাকের বাইরে এসে গেল। নৌকো বাঁচল, কিন্তু সুধন্য পড়ে গেল জলে। ছোটবাবুও টাল সামলাতে না পেরে পড়লেন

আরেকটু হলে, বংশী পাশে ছিল তাই রক্ষে। ধরে ফেলল।

সুধন্য কয়েকবার ডুবে শেষে সাঁতার কেটে নৌকো ধরলে। জলে থাকতে তার মনে হয়েছিল এক্ষুণি বুঝি সব শেষ হয়ে যায় এমনি জলের টান। বংশী হাত ধরতেই সুধন্য আবার উঠে বসল হালে।

আগেই ভিজে গিয়েছিল বৃষ্টির ছাটে, এবার ভালো করে নেয়ে উঠল।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—কাপড় বদলাবি সুধা ?

সুধন্য ঘাড় নাড়ল।—এতে কিছু হয় না ছোটবাবু।

ছোটবাবুও ভিজে গেছেন। বংশীকে দাঁড়ে বসিয়ে আবার ছই-এর তলায় এসে ঢুকলেন নিজে। ছোট বউ তৎক্ষণে সুটকেশ থেকে তোয়ালে বের করে আচ্ছা করে মুছে দিলেন ছোটবাবুর মাথা।

ছোট বউয়ের মাথা মোছানো সুধন্যর বেশ লাগল।

ছোটবাবু মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলেন।

মেয়েটা ভীষণ দুষ্টুমি করছে। ছোট বউ ধমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে, ফাঁকে ফাঁকে ছোটবাবু আর ছোট বউ কথা বলছে টুকটাক। এক একটা কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই হাসে। সুধন্য আড়ে আড়ে দেখছিল এসব। এক সময়ে ছোটবাবু কি একটা কথা বললে যেন, ছোট বউ আঁচলে মুখ ঢেকে ধমক দিলে—আবার!

কথাটা শুনে সুধন্যর মনে পড়ল উমার কথা এবং মনে হল, কি আশ্চর্য! ছোট বউয়ের ধমকের সুর আর উমার ধমকের টান একই রকম।

উমার মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। মুখের আদলে কোন মিল নেই, যেন চন্দন পাহাড়ের সাথে ছাগলের ধান খাওয়া, অথচ ধমকের ধাঁচটা এক।

মেয়েটা এক সময়ে বাপের কোল ছেড়ে হালের কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ দেখতে মেয়েটি, টুকটুকে লাল রঙ, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গোলগাল মুখখানা ভারি সুন্দর। যেন প্রতিমা। পরনে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে সেলাই করা জামা, পায়ে আবার আলতা দিয়েছে, কপালে দিয়েছে কালো কাজলের টিপ। চোখের দিকে নজর পড়তেই সুধন্যর অবাক লাগল।

কি সুন্দর এক জোড়া চোখ, ভুরুতে কালির টান, বেশ মানিয়েছে।

সুধন্য বললে,—এই যে লক্ষ্মী মা, কি দেখছ ?

জল। মেয়েটা দু'হাত ছুঁড়ে জল দেখালে।

ওই দেখছো—সুধন্য হাল তুলে দূরের কোমর ডোবা একটা গাছ দেখালে।

ঔ মা গো, দৈত্যি।

বলার ভঙ্গীতে সুধন্যর হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারলে না, মনে পড়ল রঙীর কথা। ভারি মিল।

সুধন্যর ইচ্ছে হল মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মনের মত আদর করে। কিন্তু কি ভেবে ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে আবার বাবার কোল আলো করে বসেছে। ছোটবাবু ছোট বউ গা ঘেঁষাঘেঁষি বসে। সুধন্যর ইচ্ছা হচ্ছিল সেও যদি উমাকে এভাবে পাশে বসিয়ে কোথাও যেতে পারতো। দূরে দেশে অথবা ভিনগাঁয়ে। অনেকক্ষণ সেকথাই ভাবলে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল চিন্তা করতে করতে। দূরে কোথাও যাবার যায়গা নেই, এমনই পোড়া কপাল তার।

ছোট বউ-এর বাপের বাড়ীর ঘাটে নৌকো ভিড়ল। প্রথমে সুটকেস উঠল, পিছু পিছু ছোট বউ, তাদের মেয়ে, সবশেষে ছোটবাবু।

খেয়েদেয়ে আবার নৌকোয় চেপে বসল বংশী আর সুধন্য। ফিরবার পথে প্রথম প্রথম দাঁড় টানতে ভারি বিশ্রী লাগছিল ; মাঝপথে যখন উমা-রঙীর কথা মনে পড়ল, তখন তার মনে হল তাড়াতাড়ি পেঁছিতে হবে বাড়ীতে। তারপর ঘরের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসবে সুধন্য, পাশে জোর করে বসাবে উমাকে। কারণ সুধন্য জানে, উমা কিছুতেই বসতে রাজী হবে না, তবু জোর করে বসাবে। রঙীকে কোলে নিয়ে চুলে বিলি কাটবে সুধন্য, আর এমন একটি কথা বলবে যে, উমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে উঠবে, আবার।

সন্ধ্যে হবার একটু আগেই বাড়ি এসে ঢুকল সুধন্য। তখন ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ে বুঝি।

মেয়েটা যেন বাপের আসা-পথ চেয়েই বসেছিল। দাওয়ায় পা দিতে না দিতেই গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল। বললে —উই যে, মাথ ধরবে।

দাওয়ার একপাশে একটা পলো, কতগুলো সরু সরু কাঠি, আর দলা পাকানো একতাল মাটি।

সুধন্য উমাকে শুধালে,— কি হবে গো ?

—হবে কি ? উমার গলার স্বর ভালো ঠেকল না সুধন্যর কানে।

উমা যা বললে, তা সংক্ষেপে এই।

মেয়ে দুপুরে কানুদের বাড়ী গিয়েছিল জল ঠেঙিয়ে। দেখেছে চিংড়ি মাছ

ভাজা দিয়ে পান্তা খাচ্ছে। তা মেয়ে তার হা-পিত্যেশ বসেছিল। কেউ ওকে ডেকে খেতে বলে নি। ফিরে এসে বাড়ি তুলেছে মাথায়। কত করে বললুম, তা কার কথা কে শোনে।

উমা বুঝিয়েছে—ওরা তো মাছ কিনে এনেছে, তাই না মাছ এসেছে।

মেয়ে দুহাতে মাকে বুঝিয়েছে, কেনে নি, খুদ পলো দিয়ে মাছ ধরেছে।

মেয়েকে রেগে চড়-চাপড় দিয়েছে, আর তাই দুপুরে ভাত মুখে দেয়নি এক মুঠোও। সারাক্ষণ মাকে জ্বালাতন করে করে বাঁশের কাঠি তৈরী করিয়েছে, খুদ পুড়িয়ে গোবর আর মাটি মাখিয়ে তৈরী করে রেখেছে।

উমা বললে, মেয়ে ত নয়, পেত্নী ধরেছি পেটে। মাছ মাছ করে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সুধন্যার ক্লান্তির কথা ভেবেই মেয়ের চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গজ গজ করতে লাগলে,—সারাদিন খেটে এল মানুষটা, এখন মাছ? মর! মর!

ভালা করতে গিয়েই খারাপ হয়ে গেল। সুধন্য তড়াক করে পিঁড়ি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার জুড়ে দিল।—তুই মারবার কে রে?

উমাও ফোঁস করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।—অদেখলেপনা খুউব ভালো, না?

—খুব ভালো।

—তাহলে মরোগে বাপ-মেয়েতে।

কি? কি বললি ভর সন্ধ্যেয়?—উমার চুলের মুঠি ধরে জোরে ঝাঁকুনিই দিয়ে দিলে সুধন্য। চড় কষাতে যাচ্ছিল, উমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর পারলে না।

ঝাঁকুনি খেয়েও উমা হুঁকো এনে দিলে তামাক সেজে। তামাক শেষ হতেই সুধন্য কাঠিগুলো আর খুদের ঢেলাটা নিয়ে উঠোনে নামল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। পূর্ণিমার পর ছ' ছটা দিন কেটে গেছে। সুধন্য অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ তুলে আকাশ দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখা গেল না। বড্ড কালো আকাশ। জবরজং মেঘ করেছে হয়ত।

ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল এক ঝলক। বেশ শীত শীত করছিল। গায়ে একটা কিছু জড়ালেই হতো, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একটু পরেই তো গা ডুবিয়ে মাছ ধরতে হবে, লাভ কি?

পিছল পথ। পা এখানে দিলে ওখানে চলে যাচ্ছে। দুচারবার আছাড় খেতে

খেতে বেঁচে গেল। খাইটা ডাইনে রেখে বেতবনের অন্ধকারে মাদারের সারিগুলোকে বাঁয়ে রেখে তেঁতুল তলা দিয়ে মাঠে নামল সুধন্য। অনেকদূর পর্যন্ত থৈ থৈ জল।

বেশ কিছু জল ভেঙে একটু উঁচু জমিতে উঠল সুধন্য। এখানে হাঁটুছাড়ানো জল। এক একটা কাঠি নিয়ে নাক বরাবর দক্ষিণে কাঠি পুঁতে ছোট ছোট খুদের দলা পাকিয়ে আলতো হাতে বসিয়ে দিলে কাঠির গোড়ায়।

কাঠি পুঁতে যখন ফিরল তখন আরো ঘন, গাঢ় হয়েছে অন্ধকার।

সুধন্যর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

ফিরে এসে আবার দাওয়ায় বসল সুধন্য। পলোটাকে নামিয়ে রাখল উঠোনে। হুঁকোতে জোরে জোরে টান দিতে দিতে ভাবলে, সারা দিনের ভাবনার কথা। মনে মনে হাসলে—গরীবের আবার ছোটবাবুর মতো মেয়ে কোলে নিয়ে আদর করা।

সে ভাবলে, উমা যদি ওর বেয়াড়া ইচ্ছের কথা শুনতো, নিশ্চয়ই দাঁতে জিভ কেটে গালে হাত দিয়ে বলত—মরণ! এ আবার কেমন শখ। আবার মনে হল, উমা হয়তো ভীষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। শেষে এক সময়ে ফিক্ করে হেসে ফেলতো।

পলো হাতে উঠে দাঁড়াল সুধন্য। উমা তখনো ডুলায় দড়ি বাঁধছে।

সুধন্য বললে, হলো? নইলে খুদ খেয়ে মাছ পালাবে।

উমা তাড়াতাড়ি উঠে এসে সুধন্যর কোমরে ডুলার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে, দেরি করো না কিন্তু।

আশ্চর্য! উমা চুলের ঝাকুনি খেয়েও একটুও রাগ করে নি। সুধন্যর অবাক লাগল।

মেয়ে রঙী দাওয়ার খুঁটি ধরে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, বড় বড় এনো বাবা।

মেয়ের চুলগুলোকে এলো করে দিয়ে ও বললে, আনবো। এত্ত বড়। হাত দিয়ে মাছের আকার দেখালে।

আবার সেই অন্ধকার পথ। তেঁতুল তলা দিয়ে মাঠে নামতে নামতে বিড়বিড় করে মতির-মার নাম নিলে। মতির-মার নাম নিলে খুদে মাছ আসে, এমন

প্রচলন আছে এ অঞ্চলে।

জলে নামতে না নামতেই বৃষ্টি এলো অঝোরে। হুড়মুড় করে বৃষ্টি। ফোঁটা ত নয়, যেন শর। গায়ে বিঁধছে।

প্রথম কাঠিটা ঠাওরই হলো না। এগোতে গিয়েই পায়ের চাপে ভেঙে গেল।

—এই যা!

সুধন্যর মন খারাপ হয়ে গেল। শুরুতে একি অযাত্রা!

পরের কাঠি হাত চার পাঁচ দূরেই। ঠাওর করে এগিয়ে পরের কাঠিতে পলো চাপল সুধন্য। একটি বাচ্চা চিংড়ি। ভীষণ ছোট। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় এমনি ছোট। অনেক কষ্টে সেটাকে ধরল সে। শুরুর মাছ ডুলায় রাখতে রাখতে আরেকবার মতির-মার নাম নিলে।

মাথার ওপরের আকাশটাই যেন ভেঙে পড়বে। কোমর-জলে দাঁড়িয়েও সুধন্যর মনে হল সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। শীতে নয়, ভয়ে। আরো পাঁচটি কাঠি চাপল সে। দুটো বুড়ো-আঙুল প্রমান চিংড়ি। মন কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠল।

সে মনে মনে হিসেব করে দেখলে, আটচল্লিশটি কাঠি এখনো বাকি। কম করে আরো দশ বারোটি মাছ সে পাবেই।

আরেকটি কাঠি চাপল সুধন্য।

টুপ টুপ জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। শোঁ শোঁ বাতাস। জলে ঢেউ উঠছে। খৈ ফুটছে যেন ধারা-পাতের শব্দে। বেশ বড় রকমের একটা মাছ ধরল সুধন্য।

একটা বাজ পড়ল।

চমকে জলে মুখ লুকোল। মাথা তুলতেই কেমন সির-সির করে উঠল শরীরটা। বার কয় ভগবানের নাম নিল মনে মনে।

মাছটা ডুলায় রাখতে রাখতে ঠিক করলে, এ মাছটা আজ-ই ভাজা করে রঙীকে দিতে হবে। বেশ বড় মাছ। হাত দিয়ে অনুভব করল মাছের শরীর। খুব খুশী হবে মেয়েটা।

আরেকটি কাঠিতে পলো চাপল।

কান যেন তালা লাগল সুধন্যর। বাব্বা! কি বাজখাই বাজ। কোথায় পড়েছে কে জানে। হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার। কেমন যেন মাঠ চিরে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে, জলের উপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই পায়ে।

আকাশের দিকে তাকাল সুধন্য। ঘন মেঘ চিরে চিরে এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে আঁকাবাঁকা বিজুলী। গুম্ গুম্, গম গম শব্দ হচ্ছে আকাশে।
পলোর তলায় হাত চালিয়ে দিলে সুধন্য।
তারপরের বাজ যখন পড়লো, তখন—

উমা প্রথম বাজ পড়ার শব্দেই চমকে উঠেছিল উনুনের ধারে বসে। হঠাৎ খেয়াল হতেই বেরিয়ে এল দাওয়ায়। রঙী দাওয়ার খুঁটি জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি কোলে করে ঘরে নিয়ে এল উমা। মনে মনে ভীষণ বকল মেয়েকে। লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, সোহাগে গা জ্বলে যায়!
উমা বিড় বিড় করে বকতে বকতে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দিলে। উনুনের ধারে আসার আগেই দ্বিতীয়বার বাজ পড়ল। কানে আঙুল দিলে উমা। বাতিটা হাতের আড়াল করে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। মনে মনে ঠাকুরের নাম জপলে বার কয়।
বাইরে দৃষ্টি মেলে দেখবার চেষ্টা করলে উমা। কি ঘুটঘুটে অন্ধকার। দক্ষিণের গাছগুলো দেখা যাচ্ছে না, এমন কি উঠোনের কুমড়োর মাচাটাও নয়। শুধু তুলসী গাছটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। চারদিকে ভীষণ বিশ্রী অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, আর ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ।
উত্তরের পুকুর ঘাটের অশ্বত্থ গাছে তক্ষক সাপটা ডেকে উঠল হঠাৎ। ঠোঁ-ও কো···ও···ঠোঁ···ও কো···ও।
উমাও ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে মনে মনে বললে—ঝড় বাদলার রাতেও ক্ষান্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—আহা! ডাকবে না? ভয় পেয়ে ডাকছে হয়তো।
উমাও ভাবছিল। মানুষটা ঝড় জলে কোথায় কি করছে কে জানে? অন্ধকারে কাঠি ঠাওর পাচ্ছে ত? না বাপু, যখন এত বৃষ্টি পড়ছে চলে এলেই পারতো। কি হবে মাছ দিয়ে? যদি ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজারী হয়? আবার মনটাকে ঝেড়ে ফেললে—। গা কেমন ভার ভার ঠেকে উমার।
ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। চাল বেয়ে ধারা গড়াচ্ছে মাটিতে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া যেন পৃথিবীটাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে ফেলবে।
পিদিমটা হঠাৎ বাতাসে নিভে গেল।
তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল উমা। যদি এখন ফিরে আসে মানুষটা। যদি দেখে ঘর অন্ধকার, তখন ভাববে কি? তাকে দেশলাই খুঁজতে লাগল তাড়াতাড়ি।

আরেকটা বাজ পড়ল, আকাশ ফাটানো। দাঁড়িয়েছিল উমা, বসে পড়ল। মাগো। এমন বাজও পড়ে।

দেশলাই-এ হাত ঠেকল। দ্রুত বাতি জ্বালিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবলে—কে জানে কোথায় পড়ল এত বড় বাজটা।

—মানুষের উপর?

না, না। মানুষের উপর পড়বে কেন? তাদের ঘর সংসার আছে, বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের উপর পড়বে কেন?—উমা মনে মনে বললে।

—তাহলে গাছের উপর?

প্রথমে মন বললে—পড়ুক, গাছের উপরই পড়ুক। বাড়ীর পেছনের পেঁপে গাছটার কথা খেয়াল হতেই মন সংকুচিত হয়ে গেল উমার। একটিমাত্র ফলন্ত গাছ সারা বাড়ীতে। তার মন বললে—না, না। গাছের উপরেই বা পড়বে কেন? ফুল দেয়, ফল দেয়—।

—তা হলে?

অনেক ভেবে উমার মনে পড়ল, যদি বাজ পড়ে, তবে পড়ুক দক্ষিণ-বিলের বুড়ি পুকুরের পাড়ের মরা তাল গাছটার উপর।

উমার মন খুশী হলো বাজ পড়বার একটা ক্ষেত্র খুঁজে পেয়ে। ভীষণ খুশী হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল—বড্ড দেরি করছে সে। এত দেরি হচ্ছে কেন? এত দেরি হবার ত কথা নয়?

উমা কুপিটাকে তুলে ধরে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকারের দেয়াল ডিঙোতে না পেরে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তার। ভাবলে—ফিরে আসুক একবার লোকটা, তারপরে আর কোনদিন যেতে দেবে না সে; কোনোদিনও না। এবং আজ কেন যেতে দিল একথা ভাবতে ভাবতে উমা কুপি হাতেই বসে পড়ল দাওয়ার উপর। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে সে, ঠিক তেমনিভাবে বাঁশের খুঁটিটাকে জোরে আঁকড়ে ধরে; খুব জোরে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই উমার। এক সময়ে তার মনে হল মাথা ঘুরছে, দুলছে পৃথিবী, অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। তারপর আর কিছুই জানে না উমা; সমস্ত কিছুই অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

রুক্ষ কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবী। উমার মত রাত্রিও মূর্চ্ছিত হয়ে গেল॥

দেশ/১৫ আশ্বিন ১৩৬৫

ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের মেলা ও পদ্ম

বছরের অন্য অন্য দিনগুলোর মতো আজো তেমনি কাজ পড়ে আছে পদ্মর। সেই ভোর রাত্তিরে পুকুর ঘাটে রেখে আসা এঁটো বাসনগুলো পড়ে রয়েছে। গরুগুলোকে সুপুরি বাগানে বেঁধে রাখা হয়েছে সেই কখন! এখনো দুমুঠো খড় দেওয়া হয় নি। বাছুর দুটো তেমনই ডাকছে, ছেড়ে দেবার ফুরসুত পায় নি। খড়-গোবর আলাদা করা হয় নি গোয়ালের।

বুড়ি মা সেই থেকে আগুনের মালসা সামনে রেখে তামাক টানছে ত টানছেই। এদিকে উঠোনে ঝাঁট পড়ে নি। কি জ্বালা! হাঁস-পায়রাগুলো এখনও ছাড়া পায় নি। একরকম ছুটতে ছুটতে গিয়ে পদ্ম হাঁসের ঘরটা খুলে দিল। হাঁসজোড়া বেরিয়ে যেতেই, খোঁয়াড়ের ভিতর হাত চালিয়ে দিলে। ওমা, শুধু একটি ডিম! আর? পদ্ম গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়লে, তোমার সোহাগীটা আজো ফাঁকি দিলে গো! এই নিয়ে তিন দিন। ওদিক থেকে সাড়া পাবার আশায় কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে আবার চেঁচিয়ে উঠল—হাতে পায়ে ঝিম ধরেছে জানি, কানেও কালা হলে নাকি?

পদ্মর মা জ্ঞানদাবুড়ি হুঁকোটাকে আরো কায়দা করে ধরে নড়েচড়ে বসল। পদ্ম দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বুড়ির হুঁকো টানার ধরন দেখে বললে—মরণ! তিনকাল পেরিয়েও হুঁকো টানার কায়দা দেখ। চোখ বের করে টানছে।

দেখার মত লোক কেউ সেখানে ছিল না। ভেতরের উঠোনের মাদী কুত্তিটা ছাইগাদায় একবার নড়েচড়ে চোখ মেলে আবার চোখ বুঝল। হাঁস দুটো ছেড়ে দেবার পর থেকেই প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরছে তো ঘুরছেই। তবে হ্যাঁ, দেখেছে মেনী বেড়ালটা। বসে ছিল বুড়ির মুখোমুখী, সুমুখের পা দু'খানায় চাপ দিয়ে। ধোঁয়া গিলছিল হয়তো!

পদ্ম জোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে বেড়ালটার পিঠে।—পোড়ারমুখী! ধোঁয়া গিলছে হাঁ করে। মর! মর! মুখে ঝাঁটা, ভর সকালে।

জ্ঞানদা বুড়ি আর চুপ করে থাকতে পারলে না। হুঁকো নামিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো—ভোর থেকে তোর হল কি লা, মুখে যে মন্তর ঝরছে।

—ঝরবে না ?

—কেন, হয়েছেটা কি ? কী এমন রাজকাজ পড়েছে বেগম-বাঁদীর ?

—মুখ সামলে কথা কয়ো মা। দুবেলা আস্টেপৃষ্টে গেলায় কারো কমতি নেই ; কাজ একলা করব কেন ? কি দায় আমার শুনি ?

জ্ঞানদা চেঁচাতে চেঁচাতে হুঁকো হাতেই উঠে দাঁড়াল—ও-লা রাজার ঝি, দায় আমারও বা কিসের শুনি ? সাত সকালে দায় দেখাচ্ছিস পোড়ারমুখী।

—বছরের দিনে তুমি গাল দিও না বলছি।

—দেবো না ?

মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। উঠোনে এক ঝাঁক গলা শোনা গেল।—কই গো পদ্মর মা, ও পদ্ম ? বাড়ীতে কেউ নেই নাকি ? ও পদ্মর মা…পদ্ম…। পদ্মর ইচ্ছা হলো বলে—যত সব কালা নিয়ে হলো জ্বালা। এমন পাড়া কাঁপানো বুড়ির কথাও কানে যায় নি, কেমন কান তোমাদের ? পদ্ম পড়িমরি পুকুর ঘাটে ছুটল ; ঘটি ধুয়ে বাছুর ছেড়ে দিতে হবে। কচি বাচ্চা দুটোকে এখনো ছেড়ে দেওয়া হয় নি। গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে একেবারে।

বছরের প্রথম দিনে মেলা বসে ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের। পদ্মদের ভিটের লাগোয়া সুপুরি বাগানের পাশের বিঘেকয় জমির পরেই মেলা। এ উপলক্ষে কুটুম আসে। সারা বছর যারা খবরটি নেয় না, যাদের সঙ্গে পদ্মদের রক্তের সম্পর্ক খুঁজলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, সেই লতাপাতার কুটুমদেরও আসার কমতি নেই।

একদিনের মেলা। সেই ভোর থেকে সন্ধ্যে তক রান্নাঘরেই ফুরোয় পদ্মর। ঘরের পাশের মেলাটি একটু ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখবে সে ফুরসুতও নেই।

ফুলবিউর দিন। ফুল তুলে, আম-নিমের পাতা দিয়ে মালা গেঁথে দরজায় দরজায় টাঙিয়ে দিয়েছে। ঘর, রান্নাঘর লেপে পুছে পরিষ্কার করছে। বাক্স প্যাঁটরার গায়ে সিন্দুর চন্দনের ফোঁটা দিয়েছে। কলার খোল কেটে গরুগুলোর মাথার মুকুট তৈরী করেছে, সাজিয়েছে ফুল দিয়ে। ঘিলে-হলুদ বেটে রেখেছে। তা ফাঁকি একটু দিয়েছে বৈ কি। দিয়েছে, যখন ছাগল আর ছাগলছানাটাকে বাঁধতে গিয়েছিল কলাবাগানে, তখন ছাগল ছানাটাকে নিয়ে আদর করেছে ; বুকে নিয়ে চুমু খেয়েছে, গালে ঠোনা মেরেছে। তাছাড়া পা

দুটো এক করে দাঁড়িয়েছে কোথায় ?

বাছুর ছেড়ে দিয়ে দুধের ঘটিটা শিকেয় টাঙিয়ে রেখে সাত-তাড়াতাড়ি বাসন মাজতে বসল পদ্ম। তারপরে জল তুলল তিন কলসী। পায়রার খোপগুলোর দরজা খুলে দিল। এক আঁটি খড় খুলে দিল গরুগুলোর সামনে। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোমরে আঁচল এঁটে লেগে গেল উঠোন ঝাঁট দিতে।

ওদিকের দাওয়ায় কলকলানির অন্ত নেই। পদ্মর কানে যায় না কিছুই। এক্ষুনি তরকারী কুটতে হবে, উনুনে আগুন দিয়ে চড়িয়ে দিতে হবে ডালের কড়া। এক কাঁড়ি হলুদ-লংকা বাটার পরেও দম ফেলবার ফাঁক পাবে না সে। স্নান করবে, কাপড় ধোবে। তারপর রান্না-বান্না সারা হলে এক ঝাঁক কুটুমকে খাওয়ানো।

পদ্ম তাড়াতাড়ি উঠোন ঝাঁট দিয়ে শিল-নোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লঙ্কা, হলুদ, আর মসলাগুলোকে জলে ভিজিয়ে উবু হয়ে বসল।

ইতিমধ্যেই মেলার লোকজনের শব্দ কানে এসেছে পদ্মর। সে শুনেছে ভলান্টিয়ারের কচি গলার হাঁক ডাক, নাগরদোলার ক্যাঁচ কোঁচ্।

পদ্ম একবার মুখ তুলে তাকাল।

অতিথিদের তিন তিনটি বাচ্চা উঠোনময় ছুটোছুটি করছে। ওদিকের বারান্দায় ঝিমুচ্ছে থুত্থুরে দুটো বুড়ি। একটা বউ বসে আছে ঘট সামনে রেখে। আর কে একজনা অনর্গল বকে চলেছে। জ্ঞানদা বুড়ি হাঁ হুঁ করে সায় দিচ্ছে তার কথায়।

পদ্ম ভিজে লংকাগুলোকে শিলেব উপর ফেলে জোরে জোরে বাটতে লাগল। হোক এবার বেলা, গড়াক সূর্যি পশ্চিমে ; খিদেয় চোঁ চোঁ করুক অতিথিদের পেট। বয়ে গেছে তার।

নতুন গলার আওয়াজ পেতেই পদ্ম আবাব মুখ বাড়াল। ইচ্ছে হল চুল ছেঁড়ে সে। কোথা থেকে এতগুলো লোকের মুখে ভাত জোগাবে ? অথচ বলার উপায় নেই। মানুষগুলোও কি! জ্ঞান-গম্যিও নেই যেন। পদ্মর ভীষণ কান্না পেল আগামী দিনগুলোতে তাকে ধান ভানতে, মুড়ি ভাজতে কত পরিশ্রম করতে হবে সে কথা ভেবে। অথচ এ লোকগুলো না এলেও মন খারাপ হতো সব চাইতে বেশী পদ্মর। তার মনে হতো কেমন যেন ফাঁকা বছরের এই দিনটা। সারাটা দিন তার বিশ্রীই কাটত, পাশাপাশি অন্যান্য

বাড়িগুলোতে লোক গমগম করত বলে, হাসি গল্পের শব্দে সরগরম হয়ে থাকতো বলে। সেটাও তার সহ্য হত না।

সে উনুনে কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গরুগুলোকে স্নান করাতে হবে ঘিলে-হলুদ বাটা গায়ে মাখিয়ে; গলায় ফুলের মালা, মাথায় মুকুট পরিয়ে। তারপর স্নান করবে নিজে। খইয়ের ছাতু উঠোনে ছড়িয়ে কাঁচা আম কাটবে।

পদ্ম হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। বাড়িতে যদি একটি ছেলেও থাকত! গরুকে স্নান করানো, আমের শত্তুর কাটা, এসব ত ছোট ছেলেরাই করে। লতাপাতা জমিয়ে বাড়ীতে ভোর রাত্তিরে আর সন্ধ্যায় সুর করে করে আগুন জাগানোর কাজটাও তো ছোট ছেলেদের। কিন্তু ওদের বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটিও না। না পদ্মর, না তার মার। পড়শীদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়ীতে না জাগিয়ে পরের বাড়ী আসবে কেন? যদি আসত, সে তাহলে ছাতুর নাড়ু তিলের সন্দেশ, নারকেলের পুর, মুড়ি, মলা সব দিত কোঁচড় ভরিয়ে।

মাদী কুত্তিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেই পদ্ম কাজে ফিরে এল। টাঙ্গানো বাঁশ থেকে কাপড় আর ঘিলে-হলুদের বাটি নিয়ে যেতে যেতে মাকে ডেকে বললে— আগুনটা দেখো। আমি নাইতে যাচ্ছি।

মেলার শব্দ বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আওয়াজ উঠেছে জোর। সুপুরি বাগানের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষের চলাফেরা। পদ্মর ইচ্ছা হল একবার মেলা ঘুরে আসে। নোঙরা কাপড়টার দিকে নজর পড়তেই তার মনের ইচ্ছে হঠাৎ থেমে গেল। অথচ অন্যান্য দিন সে একটুও সংকোচ বোধ করত না এতে। আজ কিন্তু তার কেমন যেন মনে হল। মনে হতেই পা আটকে গেল তার।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খাঁচকাটা ঘাটের তালগাছটার উপর পা রেখে। তারপরে কাপড়টা মাটিতে রেখে মাথা তুলবার সময় আচমকা নজরে পড়ল ছাগল আর ছাগল ছানাটা। ওমা! এতক্ষণ বাঁধা রয়েছে! পোড়ারমুখী একটুও ডাকছে না তো। অন্য অন্য দিন তো এতক্ষণে কানে তালা লাগিয়ে দিত। সাততাড়াতাড়ি দড়ি খুলে দিয়ে হাতে করেকটা তালি দিতে দিতে মাঠের দিকে তাড়িয়ে দিলে। ছাগলটা হেলে দুলে এগোতে লাগল। সেদিকে

দেখতে দেখতেই মন হল, আজ ছেড়ে দিয়ে ভালো করল না সে। চারিদিকে লোকজন। যদি…ইচ্ছে করলে ছাড়া ছাগলটা ফিরিয়ে আনতে পারত পদ্ম কিন্তু কেন যে গা করলে না। মনে মনে ভাবলে—কোথায় আর যাবে? ওই তো মাঠ।

বেলা ঢলল খেতে খাওয়াতে। ক্লান্তিতে তখন ঝিম ঝিম করছে গা। ইচ্ছে হল একবার শুয়ে পড়ে মাদুর পেতে। পারলে না। মেলায় যাবার ইচ্ছেটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে পদ্ম ভাঙ্গা সুটকেসের ভেতর থেকে সেমিজ বের করলে, থান কাপড়। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে পলকে একবার এদিক ওদিক চেয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলে। ইচ্ছে হলো আরো কিছুক্ষণ দেখে। কেমন যেন লজ্জা হল। অতিথিরা এখনো বাবান্দায় বসে আছে। অবশ্য বুড়ি বেঘোরে ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক।

পদ্ম ঘরের ভেতর পায়চারী করলে বার কয়। অতিথিরা উঠে পড়ল। একটু পরে পদ্মও।

উত্তরের সুপুরি বাগিচা, তারপরেই পায়ে চলতি পথ খালের ধার দিয়ে। পদ্ম আঁচলের কোণায় বাঁধা কয়েকআনা পয়সা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে এগিয়ে চলল সেই পথের দিকে। পেছন ফিরে তাকাল একবার। বুড়ি ঘুমুচ্ছে বেঘোরে, ঘুমুক। নইলে এতক্ষণে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত। সোমত্ত বয়সের মেয়েকে কিছুতেই মেলায় যেতে দিত না। মাথা কুটত, গাল পাড়ত। বলত—গা ঘষতে যাচ্ছিস বুঝি লা।

এর আগের আগের বছরেও একা একা মেলায় যেতে পারে নি পদ্ম। কিন্তু আজ স্বয়ং বিধাতা এলেও রুখতে পারত না। সে যেতই।

পায়ের নীচের কড়কড়ে বালিগুলো বেশ লাগছিল পদ্মর। একবার নীচের দিকে তাকিয়ে মুখ তুলল সে। লোক যাচ্ছে, আসছে। এদিকে রূপখালে জলের চিহ্নও নেই। তলার বালিগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে রোদে। এক-স্রোতা খাল। এমনিতেই জল কম, হাঁটু ডোবে না। এখন আবার উপরে বাঁধা দিয়েছে চৈতফসলের জন্যে। তাই এদিকটা একদম শুকনো। বাঁধ কাটতে আরো অনেক দেরি। কম করে মাসখানেক। পদ্ম হাঁটতে লাগল।

রূপখালের পাড়ে গাছ-গাছালি তেমন ঘন নয়। বড় গাছ খুব কম। ক্ষেত্রপাল

ঠাকুরের থান আছে যেখানে, সেখানে বড় বট গাছ আছে একটি। ডালপালা ছড়িয়েছে অনেকদূর। গাছের নীচের কাঠের খুঁটির উপরে চৌচালা টিনের ঘর। চারদিকে মুলিবাঁশের বেড়া। ঠাকুরঘরের মুখটা পশ্চিমমুখো। সামনে এখন অসম্ভব ভীড়। দরজা সোজাসুজি হাত পাঁচ সাত দূরেই পোতা হয়েছে খানিক তফাতে তফাতে লাল শালুর ফিতে জড়ানো কাপড়ের ওয়াড়ে ঢাকা একটি লম্বা বাঁশ। বাঁশের মাথায় একটি আমের পল্লব আর রক্তজবা। বাঁশের গোড়া ঘিরেই ব্রতীদের জমজমাট আসর। জলভরা ঘট সামনে, ফুল হাতে কেউ কেউ তাকিয়ে আছে বাঁশের মাথার দিকে একদৃষ্টে, কেউবা সুর করে করে কাঁদছে, কেউ কেউ মাটিতে থাবা দিয়ে দিয়ে আকুলি বিকুলি চুল ঝাড়ছে। কারো কারো উপর ভর করছে ঠাকুর। তাদের কেউ কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউবা লাফিয়ে কুঁদিয়ে একাকার। হাতের তালির, কান্নার, অসংখ্য লোকের কথাবলায় রীতিমত হৈ চৈ। কান পাতা যায় না, এমনই সোরগোল।

খালের একেবারে ধারে পোতা আছে হাঁড়ি কাঠ। মানতের পাঁঠা বলি হয় সেখানে। এবারে বলি দেরীতে, তাই এখনো উদ্যোগ-আয়োজন শুরুই হয় নি।

মেলা যদিও একদিনের, পুজো হয় দশ দিন। বাঁজা বউ, রোগা স্বামীর স্ত্রী, বছর বিয়োনো মেয়েমানুষ, এমন কি অসুখী পুরুষ মানুষরাও আসন পিঁড়ি করে বসে। যদি ভর করে ঠাকুর! যদি ওষুধ দিয়ে দেয় অসুখের।

পদ্ম ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। ব্রতীদের বসবার জায়গা ঘিরে ভলাণ্টিয়ারদের দেয়া বাঁশের ঘেরা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে মন চায় না পদ্মর। তার ইচ্ছে, ঘুরে ফিরে মেলা দেখে। মেলার মানুষগুলোকে দেখে।

এবারের মেলা আরো সরগরম। নাগরদোলাই এসেছে তিন তিনটে। সার্কাসের তাঁবু পড়েছে দুটো। জাদু খেলার ছাউনি বসেছে দুখানা। পোড়োজমি ছাড়িয়ে মেলা বসেছে পুবের ধানী জমিগুলোতে পর্যন্ত। এখন অবশ্য ধান নেই; চৈত ফসলের ক্ষেত আছে। ক্ষেতগুলোকে মাড়িয়ে মেলা জায়গা করে নিয়েছে। দক্ষিণের মজা পুকুরের ধার থেকে উত্তরের পারাপারের সেতু পর্যন্ত কত রকমারী দোকানের পশরা। আবার পুবের রাস্তার ধারে বসেছে জুয়া খেলার ইলাহি আড্ডা। তাদের পাশেই নানান তরিতরকারী, ফলের দোকান। এপাশে সার সার মনিহারী মালের ছাউনি। পদ্মর চলতে চলতে ইচ্ছে হল

এক কৌটো পাউডার কেনার। দাম দেখে কিনতে পারলে না। আরো ইচ্ছে হয়েছিল একজোড়া ফিতে, একগুছি নকল চুল, একজোড়া কানের আংটা আর রোল্ড গোল্ডের একটি আংটি কেনার। এ ইচ্ছেগুলোও নষ্ট হল তার লজ্জায়, সংকোচে। আরো একটু এগিয়ে সে একটা তরমুজ দর করল। দরে বনল না, কেনাও হল না। এক সময়ে ভাবলে কিছু মিঠাই কিনবে। বুড়ির চোখ রাঙানীর কথা ভেবে মিঠাই কেনাও তার হল না।

কতদিন মিঠাই খায়নি পদ্ম ? স্বামী মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছরে একটি বারও না। বিয়ের সময় খেয়েছিল। তারপরেও একদিন খেয়েছিল। তার স্বামী এনেছিল শহর থেকে।

স্বামী!

পদ্মর হঠাৎ কেমন যেন মনে হল। উফ্ কতদিন পর মনে পড়ল লোকটাকে। আচ্ছা, কেমন ছিল লোকটি ? ওই লম্বা লোকটির মতো ? না না, অত লম্বা নয়। ওই যে হেলে-দুলে চলছে ওর মতো ? না, অত মোটা সে ছিল না। তবে ? আজ আর ঠিক ঠিক কেমন ছিল মনে পড়ছে না পদ্মর। কত দিন আগে দেখা। আশ্চর্য। এতদিন তার মনেই হয় নি লোকটির কথা।

মাঝে মাঝে পদ্মর মনে পড়ে নি তা নয়। কিন্তু আজ সে একেবারেই ভুলে গেল সব কিছু। দুঃখের দিনে মনে পড়েছে লোকটিকে। আচমকা সুখের দিনেও। লোকটিকে ভীষণ ভালো লেগেছিল পদ্মর। কত ছেলেমানুষী, কত দুষ্টমীই না করত। কতদিন হয়ে গেল, পদ্মকে কেউই আর খুনসুটি দিয়ে রাগিয়ে দেয় নি, চুল ধরে আচমকা ছুঁড়ে ফেলে নি বিছানায়। হাসি বন্ধ করতে গিয়ে কাপড় গুঁজে দেয় নি মুখে। এমন কি, দুষ্টুমী করে পেছন থেকে আঁচলটা টেনে ধরে নি, অথবা কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে দেয় নি ইচ্ছে করে।

পদ্ম আশেপাশে তাকাল। ভালো লাগলো তার কাঁচা বয়েসী ছেলেটার গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলছে যে বউটা, সেই বউটাকে। দূরে দাঁড়িয়ে যে লোকটা বউকে বকছে, তাকেও। সব চাইতে ভালো লাগলো ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে ছেলেকে মাই দিচ্ছে যে মেয়েছেলেটা, ঠিক পদ্মর বয়েসী, তাকে। পদ্মের যদি তেমন একটি ছেলে থাকত ?

পদ্ম সে বউটাকে অনেক অনেকক্ষণ দেখল। যখন বউটা ছেলের বেয়াড়া কান্নায় ছেলেটাকে ভীষণ মারছিল, তখন সত্যিই পদ্মর খুব রাগ হয়েছিল।

ইচ্ছে হচ্ছিল বকে দেয়। এমন কি, চুল মুঠো করে ধরে ঝাঁকুনি দেবার কথাও মনে হয়েছিল। ছেলে ত কাঁদবেই। তা বলে অমন করে মারবে কেন?

একটা ধাক্কা খেয়ে সম্বিৎ ফিরে এল তার। কুচকুচে কালো একটা গুঁফো লোক অকারণে তাকে একটা ধাক্কা দিলে। পদ্ম চোখ থেকে আগুন বের করা দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। ইচ্ছে হল, গাল দেয়। মনে মনে দিলও। লোকটা একবার ফিরছে আর হাসছে।

মরণ তোর মুখপোড়া!

মুখ ঘুরিয়ে পদ্ম নাগরদোলার ওঠানামা দেখতে লাগল। কি রকম শব্দ করে উঠছে আর নামছে। পদ্ম যদি একবার চাপতে পারতো।

কিছুই কিনতে পারল না সে। আঁচলের কোণায় বাঁধা পয়সাগুলো আঁচলের কোণাতেই পড়ে রইল। কত কিছু কিনতে মন চাইছে তার, অথচ একসঙ্গে সবকিছু কিনতে পারে তেমন পয়সা তো নেই। শেষে ভেবেছিল একটি বড়রকমের পুতুল কিনবে। কাপড়ের পুতুল। বেশ লাগবে কোলে তুলে ঘুম পাড়াতে, যেমন সে ঘুম পাড়াত ছেলেবেলায়। এক সময় তার মনে হল, যদি পুতুলগুলো কথা বলতে পারত, তাহলে,—তাহলে পদ্ম যে কোন মতে হোক পুতুল একটা কিনতই। এখন পারলে না, অনেক দাম। তাছাড়া, বোবা পুতুলে তার কিইবা হবে? পদ্ম একরকম জোর করেই নিজেকে দোকানগুলোর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো।

আবার সেই ব্রতীদের হৈ চৈ। ভলাণ্টিয়ারদের হাঁক ডাক। বাখারির ঘেরা দেয়া জায়গার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। দাঁড়াল কৃষ্ণচূড়ার উঠতি গাছটার নীচে। এখান থেকে ব্রতীগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাদায় জলে মাখামাখি মুখ, মাথা, কাপড়-চোপড়। কেউ কাঁদছে সুর করে, কেউবা চিৎকার করছে মা, মা বলে। পদ্ম অনেকদিন ভেবেছে—ক্ষেত্রপাল ত ঠাকুর, অথচ তাকে মা বলে কেন? কেন বলে কে জানে! আশ্চর্য! ঠাকুরটা মা বলে ডাকলেও সাড়া দেয়—একথা মনে হতেই পদ্ম ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেল মনে মনে। ভয় পেল। তাড়াতাড়ি সে গড় করল ঠাকুরকে।

পদ্ম দেখছে ভলাণ্টিয়ারদের ছুটোছুটি। শুনল তাদের হাঁকডাকের বহর। ছেলে হারিয়েছে যেন কার, কে যেন জল চাইছে। কারা পাঁঠা ছেড়ে দিয়েছে, বাইরের লোক ধরেছে বলে সে কি ঝগড়া। পদ্ম পায়ে পায়ে ভিড় বাঁচিয়ে

এগোতে লাগল। হাড়িকাঠের জায়গাটা এখন পরিষ্কার করা হচ্ছে। একটু পরেই বলি শুরু হবে। অনেকগুলো পাঁঠা সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। উঃ এত বলি হবে! কাঁসা, ঢোল, সানাই বাজবে একটু পরে, তারপরে লাফিয়ে লাফিয়ে অসুরের মতো দেখতে ঝাঁকড়া চুলো লোকটা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটির পর একটি কাটবে। রক্তারক্তি হয়ে যাবে আশে পাশে। পদ্ম জানে, সে তখন কিছুতেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কিছুতেই না। তার মাথা ঘুরবে, চোখে অন্ধকার দেখবে, হৃৎপিণ্ড বার বার ভয়ে দুলে উঠে বার বার থমকে থেমে যাবে। না, তখন সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। তার চেয়ে এখনই ভেতরে ঢুকে একবার ঘুরে আসবে সে।

পদ্ম ঘেরার ভেতর ঢুকল।

প্রথম থেকেই তার নজর ছিল বিধবা ব্রতীটার দিকে। বয়স পদ্মর চাইতে কিছু বেশীই হবে। পদ্ম পায়ে পায়ে তার পাশে এগিয়ে গেল। ব্রতীটার পাশে একটি পুরুষ মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বিধবা মেয়েছেলেটা হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে বিকট। পদ্ম শুনতে চেষ্টা করল কি বলছে।

একটু পরেই ঠাকুরের সাথে পরিচয় শুরু হলো।

পুরুষ মানুষটা ঝুঁকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে—কি বলছে মা? ওষুধ দেবে বলছে? দিতে বল।

মেয়েছেলেটা মাঝে মাঝে গলা নামিয়ে কি যেন বলছে, শুনতে না পেয়ে বেটাছেলেটা কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করছে—পরিষ্কার করে বল।

সুর করে মেয়েছেলেটা বলছে—রাগ করেছে, রাগ করেছে।

—কেন?

—কেন কি গো। দাও নি বলে।

—কি?

—ভোগ। ঠাকুরের ভোগ।

—দেব বল।

—কবে দেবে?

—কালই দেব।

এবার মেয়েটা আরো জোরে জোরে মাথা কুটতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এলোপাথাড়ি চষে চলেছে। আর, মুখে মা মা। একটু পরে বলল—ওষুধ দেবে।

—দিতে বল।

ওষুধ দে মা, ওষুধ দে,—ডাইনে বাঁয়ে চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করতে লাগল। এক সময়ে লাফাতে লাফাতে, কখনো বা হামাগুড়ি দিতে দিতে ভিড় ঠেলে বাইরে, যেদিকে খাল সেদিকে চলতে লাগল। ইচ্ছে হল পদ্মর একবার জিজ্ঞেস করে পুরুষটাকে, এর কি অসুখ? জিজ্ঞেস করতে পারল না। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে দেখে, আরো কৌতূহলী মেয়ে-পুরুষ ভীড় করল ওকে ঘিরেই। পদ্ম সেই ভীড়ে মিশে এগোতে লাগল।

খালধারটা একেবারে খাড়াই। ঢালু যেটুকু তা হয়েছে ভলান্টিয়ারদের ওঠা-নামায়। মেয়েছেলেটা সেদিকে নামতে গিয়েই ফ্যাসাদ ঘটল। গড়িয়ে পড়তে গিয়ে বেসামাল হয়ে গেল। হাঁটুর কাপড় এলো কোমরে। কী অপ্রস্তুতে অবস্থা! পদ্ম লজ্জায় চোখ বুজল। চোখ বুজলেও কানে শুনল—কাপড়টাকে ঠিক করে দেবার জন্যে মেয়েছেলেদের ধমক।

এবারে একেবারে খালের তলায়। বালিতে আঁচড় কাটছে দুহাতে। যেন পারলে গড়াগড়ি দেয়। কতকগুলো বয়সী মেয়েছেলে সঙ্গের বেটাছেলেটাকে বলছে—ধরো, ওকে ধরো। নইলে—

বেটাছেলেটা কি করবে ভেবে না পেয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে। এবং ধরেই রইলো। ওদিকে বলির বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পর্দায় পর্দায় কাঁসা ঢোলের শব্দ চড়ছে। এখুনিই বলি সুরু হবে।

পদ্ম কয়েক পা এগিয়ে এল।

মেয়েছেলেটা পুরুষ মানুষটার হাতের বাঁধনের মধ্যে আঁকু-পাঁকু করতে লাগল ছাড়া পাবার জন্যে। বেটাছেলেটার সে কী অবস্থা! বার বার টাল সামলাতে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়েছে। মেয়েছেলেটা এক সময়ে হাতের ভেতর থেকে গলে বেরিয়ে আবার লাফাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পুরুষ মানুষটা আবার পেটের কাছে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করালে। আবার গলে পড়ল। এমনি আরো বার কয়।

এবং এসব দেখেই পদ্মর মনে কেমন যেন খটকা লাগল। সে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার বয়েসী বিধবাটার দিকে। আর তখনই তার নজরে পড়ল, সেই বিধবা ব্রতী হঠাৎ একটা চোখ খুলে মুখ দেখে নিল পুরুষটির। সে তাকানো পদ্মর মনে হল একেবারে স্বাভাবিক। প্রথমে কেমন যেন লাগল! তারপরেই পদ্ম আচমকা নাড়া খেয়ে কেঁপে উঠল। চোখ রাখল পুরুষ

মানুষটির চোখে। কী ভীষণ বিতৃষ্ণা। ঘেন্নায় লজ্জায় কেমন যেন হয়ে গেছে।

বলি শুরু হয়েছে ওদিকে। কাটা ধড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে খালে। পাশাপাশি এক একটি ছাগল এগিয়ে দিচ্ছে লোকগুলো। শব্দ নেই, হাঁক ডাক নেই। ছাগলগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়তো। অথবা যন্ত্রণায় বোবা।

পদ্মর শরীরটা সির সির করে উঠল। দুঃখ হল লোকটার জন্যে। এবং মনে পড়ল পাঁচ বছর আগের একটি রাত্রির কথা। মেঝেতে রাগ করে শুয়েছিল বলে, তার স্বামী তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তুলতে গিয়েছিল, এবং সে কেমন ভান করে হাতের ভেতর দিয়ে গলে পড়তে গিয়ে সারা শরীরে সিরসিরানি অনুভব করেছিল, সেকথা। মনে হতেই পদ্মর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। বিধবা ব্রতীটার দিকে ঘেন্নাজড়ান দৃষ্টিতে তাকিয়ে পায়ে পায়ে উঠে এল খালপাড়ে।

একবার পেছন ফিরে তাকাল। মেয়েটা জোরে জোরে মাথা কুটছে, পুরুষ মানুষটা স্থির দাঁড়িয়ে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী তার খুব ভাল লাগল। এবং তাই সে বেশ কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আচমকা একটা জোরাল ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল পদ্ম, একটি লোক হাত বাড়িয়ে বুক ঝাপটে ধরে ফেলল। লজ্জায় প্রথমে মুখ তুলতে পারে নি। পরে চোখ তুলতেই দেখল সেই কালো গুঁফো লোকটা, কুতকুতে চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পদ্ম ছুটে পালাতে গিয়ে পালাতে পারল না। ভীষণ ভীড়। ভীষণ ভয় পেল ও। লোকটা কি সেই থেকে তার পিছু নিয়েছে? সে কি চায় ওর কাছে, কী? মনে হল তার মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। মনে হল, সে টলে পড়বে। একবার ইচ্ছে হল পেছন ফিরে দেখে লোকটা পিছু নিচ্ছে কিনা? পারলে না। ভীড়ের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিল। এর ধাক্কা ওর ধাক্কা খেতে খেতে পদ্ম একটা ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলে বার কয়। মুখ তুলে দেখতে চেষ্টা করলে সে লোকটাকে। না, লোকটা নেই। পদ্মর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। বলির বাজনা থেমে গেছে। মানুষ মেলা ছেড়ে ফিরে চলেছে বাড়ীর দিকে। দোকানদাররা বাতি জ্বালাচ্ছে।

অন্ধকার ঘন হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

পদ্ম ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পায়ে পায়ে। চলতে চলতে মনে হল, এতক্ষণ মেলায় থাকা কিছুতেই ঠিক হয় নি তার। বুড়ি হয়ত বাড়ী মাথায় করছে এতক্ষণে। দ্রুত পা চালাল সে। গরু, ছাগল, হাঁস, পায়রা সব এখনো বাইরে। খড় দিতে হবে, জাবনা, অথচ সে এখনো বাড়ির বাইরে। বাড়িতে ঢোকার আগেই বুড়ির ক্যানক্যানে গলা কানে এল। বিশ্রী বিশ্রী গালাগাল দিচ্ছে বুড়ি। পদ্ম বোবা হয়ে রইল। আর শুনল ছাগল আর ছাগল ছানাটা এখনো ফেরে নি। পদ্ম চুপি চুপি ভেতর উঠোনে গেল। হাঁস-গুলো খোয়াড়ে ঢুকেছে। দুয়ার দিয়েছে বুড়িই। বেরিয়ে এল গোয়ালে। গরুগুলো বাঁধা হয়েছে। ফেন খড়ও দিয়েছে। এত সব কাজ বুড়ি করেছে— একথা ভাবতে ভাবতেই পদ্ম আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। উঃ এ কাজগুলো করতে করতে কত গালই না দিয়েছে বুড়ি। গাল দিক, তাতে গায়ের মাংস খসবে না, সে জানে। কিন্তু ছাগল আর ছাগলছানাটা? পদ্ম নিজেকেই গাল দিলে ছাগল ছেড়ে দেবার জন্যে। যা সে ভেবেছিল তাই হয়েছে। এখন কোথায় খুঁজবে সে?
পদ্ম ভিটে ছাড়িয়ে মাঠে নামল।

অন্ধকারে মুখ গুঁজে পড়ে আছে দক্ষিণের মাঠ। পুবদিকের পুকুর পাড়ের ধারটায় অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। মানুষ জন দু'চার দশটা পাড় থেকে কোণাকুণি বড় সড়কের দিকে যাচ্ছে। পদ্ম এদিক ওদিক ভাল করে তাকাল। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বারুই পাড়া। সেখানে দু'চারটে আলো জ্বলছে গাছ-গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে। সে সারা মাঠটা থৈ থৈ করে খুঁজল। পশ্চিমের খালধারেও খুঁজল। মেলার লোকজন খাল ধার ধরে বাড়ি ফিরছে। কথাবার্তা বলছে জোরে জোরে। সে আরো এগিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। না, কোথাও নেই। তবে কি খালের পশ্চিমপাড়ে গেছে? পদ্ম পায়ে পায়ে খাল পেরোল। খালপাড়েই ঘন বাঁশবন। বাঁশবনের পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলার রাস্তা, একটু এগোলেই বিঘা দশ বার জমি জুড়ে শণবন। শণবনের দক্ষিণে আখের ক্ষেত অনেক দূর ছড়ান।
কয়েকজন লোক, দু'চারটে মেয়েমানুষ, বাচ্চা কাচ্চা পদ্মকে পাশ কাটিয়ে মাঠে

নামল। লোকগুলো বার কয় তার দিকে তাকালও। অন্ধকারে কেউ কাউকে ঠাওর করতে না পারলেও ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি তার নজর এড়াল না। পদ্মর কেমন যেন লাগল। তার মনে হল, সব পুরুষগুলোই বুঝি মেলার সেই লোকটার মতো। মেলার সেই লোকটাকে মনে পড়তেই সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা পিছু নেয় নি ত? যদি নেয়, তাহলে? তাহলে সে চিৎকার করে উঠবে, সে ছুটবে। ততক্ষণে নিশ্চয়ই আশেপাশের লোকজন ছুটে আসবে। তখন? সে ভাল করে পেছনে তাকিয়ে দেখল, না কেউ নেই। নেই কিং, বাঁশবনের ওখানটায় লুকিয়ে থাকে যদি? পদ্ম কয়েক পা পিছিয়ে দেখল। না, কেউ নেই। তার বুকের ভেতর থেকে ভারী একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

অন্ধকার ঘন হয়েছে আরো, গাঢ়। মাঠের উত্তরের উত্তরপাড়ার ঘোষেদের বাড়িতে আরতির বাজনা সবে বন্ধ হয়েছে। দূরে পিদীম জ্বলছে কাদের দাওয়ায় কে জানে; আবছা দেখা যাচ্ছে। হয়ত মনার মার ঘরে। নয়ত বিলু পিসীদের বাড়িতে। পদ্ম কয়েক পা এগিয়ে ছাগলের ডাকের অনুকরণে ডাকতে লাগল—মিঁইই মিঁইই। এমনি বার কয় ডাকল। কোনখান থেকেই কোন প্রত্যুত্তর এল না। সে দ্রুত এগিয়ে গেল আরো কদ্দুর। একবার থমকে দাঁড়াল। কি যেন পাশের ঝোপের দিকে শর শর করে হেঁটে গেল। কি? সাপ, না শেয়াল? শণ বনের ওদিকটায় একদল শেয়াল ডেকে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে ডাকল। দূরের আখের ক্ষেতে শব্দ উঠল হাওয়ার। সে আরো এগিয়ে গিয়ে ডাকল মিঁই···ই মিঁই···ই।

হিজল গাছ তলায় ঘন অন্ধকার। কেয়াঝোপ জুড়েও, যেখানে জোনাকিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। উঁচু মাদারগাছের ডালে কি যেন নড়ে চড়ে উঠল। পদ্ম এদিক-ওদিক তাকাল। খাল ধারটাকে গাছের ভীড়ে কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের মতো সব কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। সে এবার আরো জোরে ডাকল—মিঁই···ই···।

দূরে একদল সাদা কাপড়ের লোক কোণাকুনি মাঠ পার হচ্ছে। তার ইচ্ছে হল ডেকে জিজ্ঞেস করে কোন ছাগল দেখেছে কিনা? হেঁকে জিজ্ঞেসও করল। ওরা কিন্তু কোন জবাব না দিয়েই চলে গেল। শুনতে পায় নি হয়ত! পদ্ম মাঠের মাঝ দিয়ে আরো এগিয়ে গেল।

ফাটাফুটি জমি। নাড়াগুলো ফুটছে পায়ে। কোথাও কোথাও এক চাষ

দেয়া জমি। পদ্ম পায়ে পায়ে আখের ক্ষেত ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেল। এমনি কতকক্ষণ চলেছে খেয়াল নেই। একদল বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। মাঠের মাঝখানে ঝাঁক ছেঁড়া একটা শেয়াল ডেকে উঠল। দূরের একদল শেয়াল গলা মেলাল। পদ্মর গা কেমন ভার ভার হয়ে এল। আর ঠিক তক্ষুণিই তার মনে পড়ল বিঘে কয় জমি পরেই জোট পুকুর। জোট পুকুরের পাড়ে বড্ড ভয়। মনে পড়ল তার ডোমিনীর মার চিতার কথা, রাখহরির বাপের গলায় দড়ি দেয়া গাছটার কথা, এবং পদ্মর চোখের সামনে ভেসে উঠল মেলার সেই কালো লোকটার কুতকুতে চোখজোড়া। সে ভীষণ ভয় পেল। চারিদিকে থৈ থৈ অন্ধকার। দূরে কাছে কোথাও কেউ নেই। ইচ্ছে হল চিৎকার করে কাউকে ডাকার। কাকে ডাকবে? বুড়ি মাকে? বুড়ি এখন কোথায়? পদ্মর সারা শরীর সিরসির করে উঠল। মনে হল সে আর দাঁড়াতে পারছে না।

ছুটেছে পদ্ম। ফাটাফুটি মাঠের উপর দিয়ে, চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে। কোন দিকে, কোথায় ছুটছে সে ভুলে গেল। তার মনে হল পেছন থেকে কে যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে তাকে। ডোমিনীর মা? না, রাখহরির বাপ? না, সেই লোকটা? উঁচু আলে হোঁচট খেয়ে পদ্ম চষা জমির উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়তেই পদ্মের মনে হল, সামনেই দাঁড়িয়ে তাব ছাগল আর ছাগল-ছানা। সে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। উঠবার চেষ্টা করল, উঠলও। কিন্তু কোথায় তার ছাগল, আর ছাগলছানা! কৈ, কিচ্ছু নেই ত! তাহলে?

পদ্মর সারা শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল, কান আলগা করল। সে কিছুই দেখল না অন্ধকার ছাড়া; কিছুই শুনল না মাথার ঝিম ঝিম ছাড়া। মনে হল এক রাশ অন্ধকার তার চোখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে। তারপরে আর কিছু মনে নেই পদ্মর।

কত রাত হয়েছে পদ্ম জানে না। যখন চোখ মেলেছে তখনো তেমনি অন্ধকার, অন্ধকার। মনে হল, হাওয়া দিচ্ছে। মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে রাশি রাশি অন্ধকার ঝাপটা মেরেছে তার চোখে। চোখ বুজে আবার চোখ খুলতেই নজরে পড়েছে এক ঝাঁক জোনাকি। আরো মুখ তুলতে চোখে পড়েছে

বিরাট আকাশ আর, এক আকাশ তারা। শুনেছে কানে, ঝিঁঝির একটানা শব্দ।

পদ্ম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। চারিদিক নিঝুম। কোথাও কেউ নেই। দূরের পিদীমের আলোও না। কাঁসার শব্দও নয়। সে টলতে টলতে মাঠ ছাড়াল। শণবন, বাঁশবন ছাড়িয়ে খাল পেরোল।

ওপাড়ে উঠেই প্রথম সে মনে কতে চেষ্টা করলে—কেন সে মাঠে গিয়েছিল? কী জন্যে?

তার প্রথমে মনে পড়ল মেলার কথা, সেই লোকটার কথা, বিধবা ব্রতীটার কথা। তারপরে মনে পড়ল, সেই বউটাকে, যে ছেলেকে মাই দিচ্ছিল। আরো মনে পড়ল তার, কচি ছেলে আর তার গা ঘেঁষে চলা বউটাকে। অবশেষে মনে পড়ল তার স্বামীর কথা। তারপর?

পদ্মর মাথা কেমন ঘুরে উঠল। ভীষণভাবে ঘুরে উঠল। তবে সে মাঠে গিয়েছিল কেন? খাল পেরিয়ে, শণবন, বাঁশবন ছাড়িয়ে উত্তর পাড়ার মাঠে, কেন গিয়েছিল? কেউ কি নিয়ে গিয়েছিল তাকে? না কি নিশিতে পেয়েছিল? না কি বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল সে?

উঠোনে পা দিতে না দিতেই বুড়ির কান্না, কান্না জড়ানো গলার বিশ্রী শব্দ আর একঘর লোকের আওয়াজ শুনতে পেল। পদ্ম দেখল ভেতর উঠোনে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে, কথা কাটাকাটি হচ্ছে। সে ভাল করে শুনতে চেষ্টা করল। হ্যাঁ, তার কথাই হচ্ছে। কেমন যেন মনে হল হঠাৎ। সে কি পালিয়ে গিয়েছিল? না তো! ইচ্ছে হল চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। পারল না।

পদ্মর মনে হল, আবার তার সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। অবশ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একরাশ অন্ধকার কাপড় চাপা দিচ্ছে তাকে। পদ্ম তবু মনে করতে চেষ্টা করল, আপ্রাণ চেষ্টা করল, কেন সে মাঠে গিয়েছিল, কেন? কি জন্যে? কেউ কি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে?

কিছুতেই মনে করতে পারল না পদ্ম। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল উঠোনেই। এবং আচমকা ডুকরে কেঁদে উঠল।

ততক্ষণে ভেতর বাড়ির লোকগুলো ঘিরে ফেলেছে তাকে। জিজ্ঞেস করছে নানান প্রশ্ন। বুড়ি হঠাৎ জোর গলায় গালগাল দিতে শুরু করেছে।

পদ্ম মুখ তুলতে চেয়েও মুখ তুলতে পারল না। মনে করতে চেষ্টা করল

কেন সে মাঠে গিয়েছিল, কি জন্যে?

সেই লোকটার জন্যে? তার স্বামীর জন্যে? নাকি অন্য কোন কিছুর জন্যে? কিছুতেই মনে পড়ল না।

জমায়েতের লোকগুলো পদ্মর মুখের উপর, দেহের উপর হ্যারিকেনের আলো ফেলে ফেলে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। তারা খুঁজছে।

পদ্ম মুখ তুলতেই তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওরা চোখ সরিয়ে নিল না। পদ্ম নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ওদের মুখের দিকে, চোখের দিকে। আর বার বার ভাবতে চেষ্টা করছে—এত জোরালো চোখে ওরা তার সারা শরীরে কী খুঁজছে? কী—?

দেশ/৫ আষাঢ় ১৩৬৬

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পথ দূরে থাক, গা ঘেঁষা মানুষটিকেও দেখা যায় না। মানদা বুড়ি, গাঁ শুদ্ধু সবারই মাসি; পাশাপাশি চলছিল হরিহরের। এক সময়ে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বললে—তা বাপ্ কবরখানা এলে বলিস্।

কেন গো মাসী?—শুধোল হরিহর।

—গা কেমন ভার ভার ঠেকে। মোছলমানের কবর, মড়া পোঁতা আছে যে!

হরিহর মনে মনে হাসে। চারকাল-ই ডিঙোতে চলেছে, তবু মরার ভয়।

হরিহর ভাবছিল অন্য কথা। এতদূর যাবে কি করে বুড়ি, পথ যে অনেক দূরের। ডিহিরগাঁ থেকে পাঁচ পাঁচখানা গাঁ পেরোলেই ভুবনডাঙার মাঠ, তারপরে রাম হাজারীর হাট। হাটের শেষে কসাইখানা। তার উত্তরের সুপুরি বাগিচা বাঁয়ে রেখে ডাইনে বেঁকে বেরিয়ে যাওয়া পথ ধরে পো-টেক পথ চললেই ডহর মাঝির ঘাট। এক পয়সা পারানীর কড়ি; ওপারে পেরোলেই পলেস্তারা খসা পুরণো তিন শিবের মন্দির। গা ঘেঁষে কয়েক ঝাড় বাঁশ। বাঁশবনের শেষে বেতোতলী, তার পরে পায়ে পায়ে তৈরী পথ সাঁকোচড়ির মাঠের উপর দিয়ে অনেক দূর। হঠাৎ আকাশ বড় হয়ে যায়, অনেক বড়। দূরের চক্রাবালরেখা চোখে পড়ে কি পড়ে না এমন দূর।

থৈ থৈ সাঁকোচড়ির মাঠ ডিঙোলেই মন্দাকিনী।

হরিহর জিজ্ঞেস করে—তা মাসী কষ্ট হচ্ছে না ত?

কষ্ট!—বুড়ি মুখ তুলে মুখ নামাল বলে মনে হল হরিহরের। বললে—না হলেই হল মাসী।

না বাপু, কষ্ট আর কিসের। মানতটা পূরণ হলেই শান্তি। জানিস তো মনু চিঠি দিয়েছে, ও আসবে; তাই।—একটু থেমে মানদা বুড়ি বললে—পেত্যয় হচ্ছে না যে!

কেন?

কেন?—মানদার লাঠি ঠুক্ ঠুক্ বন্ধ হয়ে যায়। বলে, তোর কি অজানা

বাপু।

হরিহর জানে অনেক কিছুই। সেই যে ডোমের মেয়েটাকে বিয়ে করে রাতারাতি পালিয়ে গেল তারপর মনু আর ফেরে নি গাঁয়ে। ফিরতে দেয় নি। কুলীন ঘোষের ছেলে, বিয়ে করল কালো কুচ্ছিত নগা জেলের মেয়েকে। পাড়ার লোক বললে – শালা গাঁয়ে ফিরলে ঘাড় মটকাব। সেই যে বিয়ে করে পালালে আর কেউ তাকে দেখে নি গাঁয়ে। মানদা বুড়ি বাগানের ফুল ফল আগলে আছে এখনো। মানদার বিশ্বাস, ছেলে একদিন ফিরে আসবে গাঁয়ে ; জমি-জমা ফুল-ফলের হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে ছুটি নেবে মানদা। একেবারে ছুটি। তা সে ছেলে চিঠি দিয়েছে, সে আসবে। সে আসছে। সে চিঠি হরিহর পড়েছে, মানদা হরিহরকে আশীর্বাদ করেছে চোখের জলে। এখন চলেছে বারুণী উপলক্ষে স্নানে। মন্দাকিনীর জলে। মানত আছে মানদার, পাঁচ পয়সার নৈবেদ্য ভাসাবে জলে, ডুব দিয়ে ন্যাড়া করবে মাথা।

খালও নয়, চড়া ; তবু লোকে বলে মন্দাকিনী নদী। বর্ষায় ছাড়া আর পাঁচ ঋতুতে জল গড়ায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তিন হাত প্রস্থ নদীর আড়াই হাত জুড়ে রেত বালু। যে টুকু জল চলে তাতে পায়ের পাতা ডোবে না এমন জল। গাছগাছালী তেমন নেই, দুচারটে ঝোপ, লতায়-পাতায় জড়ানো জটার মতো এখানে ওখানে ছড়ানো। এপাশের যেখানটায় মেলা বসে সেখানে বড় একটা মজা পুকুর। ঘাট নেই, কিছু নেই। যেটুকু জল আছে তলায় তাতে ঘন কচুরীর জঙ্গল। পাড়ে জোড়া বুড়ো বট, শিকড় জুড়েছে অনেক দূর। দূরে যাত্রীদের ছায়া দেয়, তীর্থযাত্রীদের ঠাঁই। মেলা বসে ষাট-সত্তর বিঘে জমি জুড়ে। এপাশে সেবা সংঘের জলছত্র, ওপাশে যাত্রী পরিত্রাণ কমিটির ভলান্টিয়ারদের আস্তানা। পূবদিকে দীঘির ধার থেকে মেলা কমিটির খিচুড়ী দান ছত্র।

কদমপুর পেরিয়ে ওরা ঢুকল সোনাগাঁয়ে। এর পরে ছিলাতলী, ডাহুকী, গাঁওখালী। তারপরে ? সরকারী হিসেব নেই, লোকে বলে, পুরো এক রাতের পথ। পথে জিরোন দিলে বার দুই তবে সকালটাও লাগে। তা জিরোন না দিয়ে উপায় কি ? মানুষ ত আর যন্তর নয়। তাও যদি জোয়ান মানুষ হয় তাহলে অন্য কথা। বেশির ভাগই বুড়ো-বুড়ির দল, দুদশজন বউ ঝি, আর

জন কয় ছেলে-ছোকরা। পারে পায়ে ঠোক্কর খায়, দু'চার পা চলতেই হোঁচট। তা হলেও ছিটকে পড়ে না; সামলে নেয়। চলতে পারছে না পারছে না করেও পথ চলে। না চললে চলবে কেন? লোভ তো আর স্বল্প নয়। যত পাপ করেছে সব শোধ হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার জন্মের কষ্ট সইতে হবে না, একেবারেই জীবন্মুক্তি! হবেও বা!

হরিহর হাঁক দিলে—সামলে চলেন মা-মাসী, ভাই-বোনেরা। হোঁচট খেলে পায়ের দফা রফা হবে।

চোখজোড়া অন্ধকারেও একবার চারদিক বুলিয়ে নিল।

অসম্ভব নিস্তব্ধ পথ। ঝিঁ ঝিঁ আর সুতোকাটা পোকা গলা মিলিয়ে গান ধরেছে। সুপুরীর ডালে বাতাস লেগেছে জোর। দু'চারটে ঘুমভাঙা পাখীর হঠাৎ কিচির মিচির।

উলের আলেয়োনটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিলে হরিহর।

•

সেবারের স্নান পেল ফাল্গুনের শেষাশেষি। শীত তখনো তেমন করে কাটে নি। মাঝরাতে ঘরে শুয়েও কাঁথা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিতে হয়। হরিহর বলেছিল—চ্যাংড়াগুলোকে ছেড়ে যান মা-মাসীরা।

তা কার কথা কে শোনে! বয়সীরা না করলে ছেলেদের জেদ বাড়ে। অগত্যা হরিহর সায় দিয়েছে—যাবেন তো সবাই, হ্যারিকেন নিতে ভুল করবেন না যেন। তা অনেকেই হ্যারিকেনের কথা ভুলে গেল। যারা ভোলেনি তাদের কেউ কেউ বললে—ছিল বটে, তবে চিমনির কাঁচ ফেটে গেছে। কেউ বললে—ফিতে ফুরিয়ে গেছে। আর কেউ জানালে—তেল বাড়ন্ত তাই হল না।

হরিহর মনে মনে বলল—ভালই।

পুণ্যের লোভ হরিহরের নেই, তার লোভ পথ চলার।

কে যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। ছুটে গেল হরিহর।

দাঁড় করাতে করাতে স্পষ্ট ঠাওর হল হরিহরের, চৌধুরীদের বিধবা বউ অপর্ণা।

হরিহর বললে—দেখে চল।

দেখেইত চলছিল, তবু হোঁচট খেল। অপর্ণা কেঁদে ফেলল হরিহরের হাত ধরে। কি করবে ভেবে পেল না হরিহর। বউটার ঢঙ-ঢাঙ ভাল নয়, তবু শান্ত মিষ্টি গলায় বললে—কাঁদলে কি হবে?

কিছুই হবে না—গলায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললে বউটা।

হবেই না তো—হরিহর জানাল হাত ছাড়াতে ছাড়াতে।

বউটা কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়লে না। বললে,—গাটা কেমন কাঁপছে।

কাঁপছে। হরিহরের ভীষণ হাসি পেল। মনে মনে বলল—কাঁপবে বৈ কি! মুক্তির লোভে নয়, মোক্ষের আশায় ছুটেছ, গা কাঁপবে না। একশ বার কাঁপবে। এ কি সহজ আকাঙ্ক্ষা! মনে মনে অপর্ণাকে বকল।

ডাহুকীতে ঢুকেই মানদা বলল—ওরে হরি, আফিঙের কৌটোটোতে পাচ্ছি নে বাপ।

এনেছেলে ত? হরিহর প্রশ্ন করে।

এনেছি গো।

কাপড়ের বোঁচকায় হাত ঢুকিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। হরিহর মানদার হাতে তুলে দিতেই মানদা বলল—আমার যত চুল তত পরমায়ু হোক তোর।

হরিহর অতিকষ্টে হাসি চাপে। মাথায় টাক পড়ে পড়ে চুল কয়েক ছড়া আছে কি নেই। বললে—তা মাসী আশীর্বাদ ফলবে ত!

ফলবে না মানে? বুড়ী চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যায়।

ফললেই হল। হরিহর হাই তোলে আপন মনে।

দুজনেই পিছিয়ে পড়েছে একটু। হরিহর বলল—একটু জোরে পা চালাও মাসী।

এই যে। জোরে জোরে লাঠির শব্দ করে।

পথ চলতে চলতে হরিহর কথা তুলল—মাসি, সত্যি মিথ্যে জানি নে, শুনলুম একদিন মনু এসেছিল নাকি?

মানদা বুড়ি চলা থামিয়ে লাঠি শুদ্ধু গালে হাত ঠেকায়।—সে কি কথা রে! বললে কে?

হরিহর বলল—কানাকানি করছিল, শুনলুম।

মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে!—মানদা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে। বিড় বিড় করতে করতে বলে—বিশ্বাস কর, মনু যদি আসবেই বাপু তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? ভিটে, বাড়ী, ফুল-ফলের বাগান সব বুঝিয়ে দিয়ে ছুটি নিতাম। সে আর এল কৈ!

কেন যেন তবু হরিহরের মনে হয় মনু এসেছিল। কথা বাড়াল না, বলল—তা

মাসী এবার সুপ্রীর গাছ লাগালে নাকি ?

না ত।

আমের বাগান ?

না গো, না।

ডাবগুলো ঝুনো হয়ে গেল, বেচবে না ?

ঝুনো আর হল কৈ ? কাঠবেড়ালীর জ্বালায়। বুড়ি চুক্ চুক্ শব্দ করে।

লেবুগুলো ?

আরেকটু রঙ ধরুক।

এছাড়াও আছে পেয়ারা, আমলকী, পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল আরো কত ফলের গাছ। হরিহর আপন মনে ভাবে মানদার কথা। ছেলে বুড়ো কাউকেই ঘেরা ডিঙোতে দেয় না। চার চোখো যেন। কেউ ঢুকেছে কি অমনি হাঁক দেবে—কে রাড়ীর পুত গাছে ওঠে ? হাভাতের বাচ্চাদের জ্বালায় আর টেঁকা গেল না। স্বামী সোহাগীদের মেয়েগুলো মেয়ে ত নয়, হাড় বজ্জাতের ঝাড়। জ্বলে পুড়ে মলাম। এর পরেই লাঠি হাতে ছুটে যায় মানদা।

আগে আগে অনেকেই বিরক্ত করত, এখন তেমন কেউই আর যায় না। সময়ে অসময়ে চিঠিপত্তর পড়াতে লেখাতে হয়, মানদা যায় হরিহরের কাছে। বলে—বাপু পড়ে একটু লিখে দে ত। আমসত্ত্ব খাওয়াব। লেবু খেতে চাস তো তাই সই।

সব কিছুই খাওয়াতে রাজী, যতক্ষণ কাজ না হবে ; কাজটি ফুরলেই আবার যেই পাজী সেই পাজী। বুড়ি বলে—খাবি বৈ কি। সব ত তোদের বাপ। মনু আমার আর তো ফিরবে না, তা হলেই ত তোদের! নয়, বল ?

তা বৈকি! হরিহর কথায় ইতি টানে।

ডহর মাঝির ঘাটে সবাই এসে গেছে। খেয়ার মাঝিকে অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না। কোথায় সটকে পড়েছে কে জানে ? শেষ পর্যন্ত শীতের রাতে ওপারে সাঁতারে পেরিয়ে ঘাটে বাঁধা নৌকা আনতে হল হরিহরকে।

চৌধুরীদের বউ ফাঁকে ঠাট্টা করতে ছাড়লে না। বললে—খুব দেখালে কিন্তুক।

হরিহর কিছুই বললে না।

শিব খুড়ো থেকে চন্ডীর মা সবাই হরিহরের মাথায় এ পর্যন্ত যত পুণ্যি করেছে সবই ঢেলে দিল। বললে—বেঁচে বর্তে থাক। অক্ষয় আয়ু হোক

তোর। সুখে শান্তিতে ঘর কর।

ওপারে উঠেই সবাই ছুটল। ঘাটে দড়ি বাঁধার দেরীটুকুও সইল না। দাঁড়িয়ে রইল শুধু অপর্ণা।

হরিহর ক্ষোভের সঙ্গেই বলল—তুমিও যাও।

যাবই তো। তার আগে কাপড়টা পাল্টাও।

বাড়তি কাপড় হরিহর আনে নি। অপর্ণা নিজের থান একখানা এগিয়ে দিলে। অগত্যা হরিহরকে পরতে হল।

শিবু খুড়োর মন্তব্যের ছিটে ফোঁটা কানে এল পথ চলতে চলতে।—কর ঢলাঢলি, তীর্থ করতে যাচ্ছে! তাই তো বলি—

হরিহর পা চালাল জোরে।

অপর্ণা বলল—ঘোড়ার মতো ছুটছ কেন?

মুখ ফিরিয়ে কি একটা বলতে গিয়েও বলল না।

অপর্ণা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে হাত ধরল হরিহরের। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না সে। চৌধুরীদের বৌ-এর অনেক দিনের সখ, তীর্থের পথে একটু যদি মেটে তবে মিটুক।

দলছাড়া হয়ে পড়েছিল মানদা, পিছিয়ে। হরিহর-অপর্ণার সাথে দেখা হয়ে গেল।

মানদা শুধল—এর পরেই ত বেলতলী, না রে?

হ্যাঁ মাসী।

তার পরেই সাঁকোচড়ির মাঠ। না?

তুমি কি করে জানলে?

আমার বাপের বাড়ী যে এখানেই।

হরিহর একথা এই প্রথম জানল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

বেলতলীর বড় দীঘির পাড়ে উঠে সবাই বলল—এবার জিরোন দেও।

বলার সাথে সাথেই সবাই হুড়মুড় করে বসে পড়ল, শুধু মানদা বুড়ী ছাড়া।

বুড়ী বললে—আমি বুড়ো মানুষ, একটু এগিয়ে যাই।

—পথ ভুলে গেলে?

হরিহরের মুখের কথা টেনে নিয়ে মানদা বললে—বাপের বাড়ীর দেশ। পথ ভুলব কেন? ঠাওর করে ঠিকই যাব।

মানদা বুড়ীর লাঠির শব্দ মিলিয়ে গেল।

একটা বিড়ি দে ত হরিহর। শিব খুড়ো হাত বাড়াল।

বিড়ি এগিয়ে দিয়ে মনে মনে বললে—তীর্থের পথে ধার খুড়ো, পথ ঠেকে যাবে যে।

শিব খুড়ো বিড়ি ধরিয়ে টান দিতে দিতে জানালে—তা ভাইপো তুই ছিলি, নইলে তীর্থ হয়েছিল।

আশেপাশের সবাই সায় দিল কথায়।

ছেলে-ছোকরারা অনেকেই গাইগুই করছে। হাঁটতে পারছে না, ঘুম পাচ্ছে। ক্ষিদে পেয়েছে। বুড়ো-বুড়ীরা তকরার করছে খুঁটিনাটি নিয়ে। অপর্ণা চুপি চুপি হরিহরের হাতে একটা চাপ দিল।

অন্ধকারেও চোখ এড়াল না শিব খুড়োর। কিছু না বলে কাশির মাত্রা বাড়িয়ে দিলে।

হরিহর বললে—মানদা মাসীর এ কি ঠিক হল খুড়ো?

খুড়ো আরো জোরে জোরে বার কয় কাশল। বললে অনেক কষ্টে—তা বাপের বাড়ীর দেশ, ঠিকই চলে যাবে।

যাবে ত?

হরিহরের মনে হল, রাত আর তেমন নেই, একটু পরেই ত ভোর।

হরিহব ভাবছে আশপাশের মানুষগুলোর কথা। কেমন মানুষ এরা! এত পরিচিত তবু যেন অপরিচিত ঠেকে তার নিজের কাছে। ভাবতে ভাবতে ওর ভীষণ হাসি পেল। এক পয়সার পারানীর কড়ি দিতে হল না, ব্যস্ তাতেই আশীর্বাদের ঝুড়ি উজাড়। আবার সে সঙ্গী হয়েছিল বলে সে কি খুশি। তাও যদি একটু ভাল মনে যেত। শিব খুড়ো ত গলা বাড়িয়ে গরল ঢালল। তা ঢালুক, ওতে ওর কিছু হবে না; কিন্তু অপর্ণার? ইচ্ছে হল অপর্ণাকে বারণ করে, পারল না। অন্ধকারেও অপর্ণার চোখ জোড়ায় যেন কাতর মিনতি, হরিহরের মনে হল।

দূরের বাঁশবনের উপর দিয়ে রাতের বাতাস বয়ে গেল। একটা মিষ্টি শব্দ কানে এল হরিহরের। পাখীর কিচির মিচিরের শব্দ। হরিহর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—মা-মাসীরা ওঠেন।

উঠবে কি? পা যেন সবারই আটকে গেছে। হরিহর জানাল ভোর হবার আর দেরী নেই। দেরী তো নেই, কিন্তু পা যে চলে না। তাই আরো কিছুক্ষণ

বসতে হল। হরিহর দেখছে দীঘির জলে নক্ষত্র জ্বলছে অজস্র। দেখল, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিন্যস্ত গোটা আকাশটাকেই দীঘির জলে। দূরে কোথায় যেন পেঁচা ডাকল। হরিহর চোখ মেলে দিল সামনের দিকে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না : তবু সে অনুমান করল, অনেক দূরে সাঁকোচড়ির মাঠ। মাঠের উপর দিয়ে মানদা বুড়ী বেঁকে কুঁজো হয়ে যাওয়া দেহটাকে টেনে নিয়ে নিয়ে চলেছে মহাতীর্থ মন্দাকিনীর পথে। যার জলে স্নানে পুণ্য, যার জল পানে পুণ্য।

পুরানে আছে,—যোজন বিস্তারী অযুত যোজন দীর্ঘ যে নদী, যার জল ক্ষীর তুল্য, সেই প্রধান ধারাই মন্দাকিনী। সে নদী বৈকুণ্ঠ থেকে ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গে, স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এসেছে একালের মানুষের পরিত্রাণে।

এই সেই মন্দাকিনী!

হরিহরের গা ঘিন ঘিন করে ওঠল। দরকার নেই তার স্নানের আর পানের পুণ্যে ; স্নান হয়তো করা যায়, কিন্তু পান নৈব নৈব চ। মুখে দেবে কি, ঘেন্নায় পেটের পিত্তি বেরিয়ে আসবে না ? মলে মলে একাকার!

দু'মাস আগে থেকে বাঁধ দিয়ে জল ধরেছে মেলা কমিটি। আশপাশের গাঁয়ের মানুষ দু'মাস ধরে বাহ্যি করে শৌচকর্ম করেছে এ জলে। এতে আপাদমস্তক ডোবাবে হরিহর ? তার চাইতে যদি নরকে যায় সেও ভাল।

সারাক্ষণ মেলায় ঘুরল হরিহর মানদা বুড়ীর খোঁজে। শেষ পর্যন্ত দেখা পেল। গলা জলে দাঁড়িয়ে হাতের ঢেউয়ে মল সরিয়ে ঘন ঘন ডুব দিচ্ছে বুড়ী। পাড়ে উঠতেই হরিহর বলল—তা মাসী, একসঙ্গেই যাব।

মাসী শুধলে—ডুব দিয়েছিস ?

হরিহর ঘাড় নাড়ল।

মাথা ন্যাড়া আগেই করেছিল। নৈবেদ্য ভাসিয়ে দিয়ে হরিহরের সঙ্গে সঙ্গেই এল মানদা। উপোসে তেষ্টায় বেশ কাহিল হয়ে গেছে। হরিহর পা চালাতে চালাতে বলল—যাবার পথে রেলে যাব মাসী।

রেলে ?—মানদা মুখ তুলে তাকাল।—কখন যাবি ?

বিকেলে।

বিকেলে।—বুড়ি বললে—না বাপু, আমি হেঁটেই যাব। আমার ভিটে বাড়ী, ফুল-ফলের বাগান, দেখবে কে ? এতক্ষণে কাক-পক্ষীর হাট বসে গেছে হয়ত।

হরিহর বলল—অনেক আগে পৌঁছব মাসী।

কি করে? ইস্টিশান থেকে হাঁটতে হবে না?

তা হবে, ক্রোশ দু'তিন।

মানদা বললে—ঐ হল। তাতে কমল কি?

হরিহর যত বোঝায়, বুড়ি ঘাড় নাড়ে।

মালসায় চিঁড়ে কলা মেখে গিললে কিছু। হরিহব জিজ্ঞেস করলে—মিঠাই খাবে?

মানদা বলল—না বাপু। তুই যে বলেছিস্, ওই ঢের।

কিনবে কিছু?

মানদা ভাবলে ক্ষণ কয়। বলল কিনব, দুটো মাটির মালসা, আর একটা মাটির ঘোড়া। বাড়ী ফিরে দরজায় টাঙিয়ে দেব।

কি হবে?—শুধল হরিহর।

কিছু না, এমনি ইচ্ছে হল, তাই। হরিহর বুড়ীর ছেলেমানুষী দেখে হাসল। বলল—চল কিনে দিই।

কেনাকাটা হয়ে যেতেই মানদা লাঠি হাতে পা বাড়াল।

অনেক দূর যেতে হবে তাকে, মন্দাকিনী থেকে ডিহিরগাঁ।

হরিহর ভাবলে সেও যায়। অপর্ণার জন্যে হল না। মনে হল সে চলে গেলে অপর্ণা মাথা কুটবে।

চৌধুরীদের বউ ওকে ভেবেছে কি?

বিকেলের ট্রেনে ওঠা হল না। ভিড়ে ভিড়াক্কার। ধাক্কাধাক্কি করা হরিহরের ধাতে সয় না। শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হল। আবার হাঁটা পথে সাঁকোচড়ীর মাঠের শেষে বেলতলী, তারপর ডহর মাঝির ঘাট, ভুবনডাঙার মাঠ, গাঁওখালী, ডাহুকী, ছিলাতলী, সোনাগাঁ, কদমপুর, ডিহিরগাঁ। পথের কথা চিন্তা করতেই হরিহর হাঁফিয়ে ওঠে।

এক চোখের পথ সাঁকোচড়ির মাঠ। দূরের গাঁ দেখা যায় কালো সরু রেখার মতো। এদিকে ওদিকে থৈ থৈ মাঠ আর মাঠ। ধানহীন, রিক্ত। বিকেলের ভাঙা আলোয় সারা মাঠটাই ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠল হরিহরের চোখে। দূরের একলা বটগাছের শীষে রোদের ফুল চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। মাঠের মাঝ চিরে বেরিয়ে যাওয়া মজা খালের ধারের কেয়া ঝোপগুলো বেশ লাগে মিঠে

রোদে। মাঝে মাঝে ছড়ান বাঁনার ঝোপ, এলোমেলো হাওয়ার মাথা দোলাচ্ছে। এদিক ওদিক ছড়ান আল। মাঠ ফেটে গেছে অজস্র ফাটলে।

এতসত্বেও পথ চলতে কেন যেন বিরক্ত লাগে হরিহরের। তবু পথ চলে।

এখানে আকাশ অনেক বড়। আর বিরাট আকাশের নীচে চৌধুরীদের বউ অপর্ণাকে মনে হয় ভীষণ ছোট। যেন একটি ডাহুকী।

রোদের তেজ কমছে ক্রমে ক্রমে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল মাটির দেহে ছায়া এঁকে এঁকে গাঁয়ের দিকে। দূরে, দক্ষিণের মজা খালের ঝোপের ওপাশটায় বিন্দুর মত কতকগুলো কি যেন উড়ছে মনে হল চক্রাকারে। একটু এগোতেই স্পষ্ট হল হরিহরের চোখে। শকুন উড়ছে। গরু মরেছে হয়ত। শকুনের হাট বসেছে, মেলা। কত শকুন। অথচ এমনি শকুন দেখতে পাওয়া যায় কদাচিৎ। মড়ার গন্ধে কোথা থেকে যে ছুটে আসে, কে জানে। মুখে বলল, পা চালান জোরে জোরে, সন্ধ্যে হল বলে।

সাঁকোচড়ির মাঠেই সন্ধ্যে হল। আবার নক্ষত্র নক্ষত্রে ছেয়ে গেল আকাশ।

গাঁয়ে পেঁছেই হরিহরকে কাজে চলে যেতে হল ভিনগাঁয়ে। দিন দুই পরে ফিরে এসেই শুনল মানদার খবর। হরিহর ছুটে গেল মানদা বুড়ির ভিটেয়। কোথাও কেউ নেই। ঘরের দরজায় মস্ত বড় তালাটা ঝুলছে। পায়ে পায়ে ভিটের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। লালমুখো একটা পাখী পেয়ারা গাছের ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে কাঁচা-পাকা পেয়ারা ঠোকরাচ্ছে। কাঠবেড়ালীগুলো খসু খসু করে ছুটে বেড়াচ্ছে নারকেল গাছের ডালে ডালে। একটা হলুদ পাখী কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে ঠকু ঠক করে ঠোঁট বসাচ্ছে। ওপাশের বাতাবি লেবু গাছের মরা ডালে বসে জোরে জোরে ডাকছে একটা কাক। হরিহর পা বাড়াল।

আস্তে আস্তে ঘরের সামনের শিউলী গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল হরিহর। চড়ুইগুলো শনের চালার ভেতর থেকে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে। চারদিকে অবিন্যস্ত নির্জনতা। না, সেই মেলায় কেনা মালসা আর মাটির ঘোড়া কোথাও নেই। হরিহর চোখ ফেরাল।

আম গাছের ডালে গুটি ধরেছে অজস্র, কাঁঠালেও। বেল গাছ ঝুলে পড়েছে ফলের ভারে। হঠাৎ চোখ গেল পেঁপে গাছের মাথায়। রঙ ধরেছে অনেক গুলোয়। রোদের রঙ নয়, পাকা ফলের রঙ।

এক ঝলক বাতাসে সমস্ত গাছগুলো নড়ে চড়ে উঠল।

আঁজলা ভরে জল তুলেছিল মানদা বুড়ি, হাতের কাঁপুনিতে সব জল ঝরে গেছে, মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। হরিহরের মনে হল, তাই বা কেন। তার মনে হল, সম্ভাব্য সমস্ত কিছুকে আঁচলের পরিসরে ধরে রাখতে চেয়েছিল মানদা মাসী পারে নি, ছড়িয়ে গেছে।

এবং তার মনে পড়ল, মন্দাকিনী থেকে ফেরার পথে সাঁকোচড়ির মাঠের মজা-খালের ঝোপের ওপাশে চক্রাধারে ওড়া অজস্র বিন্দুর কথা। কাছে আসতেই যেগুলো স্পষ্ট হয়েছিল তার চোখে। সংখ্যাহীন শকুন আর শকুন। মানদা মাসী কী ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল? ওই ফাটা-ফুটি মাঠের উপর? কে জানে!

হঠাৎ হরিহরের মনে পড়ল, চৌধুরীদের বিধবা বউ অপর্ণাকে। মনে পড়ল শিব খুড়ো চণ্ডীর মা, বেতো পিসী, আর রাখহরির বাপকে। হাসি পেল। তার মনে হল, ডিহিরগাঁ থেকে মন্দাকিনী অনেক দূর, আরো দূর সেই যোজন-বিস্তারী অযুত যোজন দীর্ঘ নদী, যার জল ক্ষীর তুল্য, যে নদী বৈকুণ্ঠ থেকে ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গে, স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এসেছে॥

বিচিত্রা/আশ্বিন ১৩৬৬

এক জোড়া হাঁস ও একটি মেয়ে

রাস্তার ধারের খাদে শামুক খুঁজছে ক্ষেমী। শামুক রাখার হাঁড়িটা ভাসছে জলের উপরে। একটু নড়লে চড়লেই জলের ঢেউয়ে হাঁড়িটা সরে যায়, ক্ষেমী শামুক রাখতে গিয়ে কাছে টেনে নেয়, আবার সরে।

পরনের কাপড় হাঁটু তক ওঠান, আঁচলটা কষে কোমরে বাঁধা। জলে ঢেউ লাগলে হাঁটু ছাড়ায় জল, পাড়টা ভিজে যায়; ভিজুক। ক্ষেমীর সেদিকে খেয়াল নেই। জলের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে দুই হাতে জলের তলায় শামুক খুঁজছে তন্ন তন্ন করে। সেই পড়ন্ত বেলা থেকেই খুঁজছে।

মুন্সীর হাট থেকে একজোড়া হাঁস কিনেছে ক্ষেমী। পরখ করেই কিনেছে। সে একা পরখ করে নি, আরো অনেকেই পরখ করেছে। কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয়, তাই হল। হাঁসজোড়ার একটি মদ্দা। মাদীটারও ডিম দেবার নাম নেই, এক পেট খাওয়া। শুধু তো খাওয়া নয়, ঘরদোর তছনছ করে কত। মদ্দাটাকে ক্ষেমী বেচে দেবে। যদি না বেচে, তাহলে, তাহলে সেটাকে সে কেটে খাবে।

দিনকয় পর পর ভেবেও ক্ষেমী কি করবে ঠিক করতে পারে নি।

যদি বেচে তাহলে নিদেন তিনটি টাকা পাবে; যদি খায়, তাহলে এবেলা-ওবেলাতেই মাংস ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে, কারণ, নন্দাদের একবাটি দিতে হবে, মধুর মাকেও। সোহাগীর মা ত হাঁসের একটি মদ্দা একথা জানার পর থেকেই মুখিয়ে আছে। তাকে একবাটি না হোক আধবাটি দিতেই হবে। আর যদি বেচার বাপ টের পায় নিশ্চয়ই চাখতে চাইবে নিলজ্জের মত। এছাড়া—ক্ষেমী একমুঠো শামুক রাখল হাঁড়িতে।

হ্যাঁ, আরো দিতে হবে যদি ভাস্কর মুন্সী রাঙামাটি থেকে ফেরে, যদি সুবলকা' হঠাৎ খোঁজ নিতে আসে ভাইঝির।

ক্ষেমী খালি হাতেই মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কোমর টনটন করছে। শরীরটাকে পেছনের দিকে ভেঙে একবার কোমর ফোটাল। একবার সামনে ঝুঁকে সোজা হল। এখন একটু কম মনে হচ্ছে।

ক্ষেমী কোমরে হাত রেখে এদিক ওদিক তাকাল।

সন্ধ্যা হয় হয়।

ইতিমধ্যেই হাঁড়িটা বেশ দূরে সরে গেছে। একেবারে খাদের মাঝখানে। ক্ষেমী হাত বাড়িয়েও নাগাল পেল না। একটি পা বাড়াল, তবুও না। আরো এক পা বাড়িয়ে ঝুঁকে হাঁড়িটা ধরতে গিয়ে পা পিছলে কোমর জলে গিয়ে পড়ল। কাপড় সামলাতে চেয়েও পারল না। কাপড় ভিজল, এবং হাঁড়িটা আরো দূরে সরে গেল।

ওপাড়টায় কচুরিপানা জমেছে। হাঁড়িটা কচুরিপানার গা ঘেঁষে স্থির হয়ে রইল। ক্ষেমী খেপে এগিয়ে গিয়ে একমুঠো কচুরীপানা টেনে আনল। ঢেউ লাগল জলে, হাঁড়িটা আবার নড়ে সরে গেল। রক্ত এতক্ষণে মাথায় চড়েছে ক্ষেমীর। একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁড়িটাকে ধরল। এবং ধরেই রইল। ইচ্ছে হল হাঁড়িটাকে ডুবিয়ে দেয় জলে, অথবা গুঁড়িয়ে দেয় ডাঙায়। ক্ষেমীর ভীষণ রাগ হল। কাপড়টা ভিজে গেছে বলেই তার রাগ। সবেধন অঙ্গে একটিই ত কাপড়। সেই কাপড়টাই ভিজে গেল। এখন ভেজা কাপড়ে বাড়ি যাবে কি করে? অসুখ করবে না?

ক্ষেমী পায়ে পায়ে জলের উপর উঠে এল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে

পাখিরা উড়ে উড়ে মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পশ্চিমের ডোবা সূর্যের রঙও হারিয়ে গেছে। গাঁগুলো তলিয়ে গেছে অন্ধকারে। গাঁয়ের মানুষগুলোও। ক্ষেমী কাপড়টা এখানে ওখানে ধরে ধরে নিঙড়াতে লাগল। মাঠের উপর চাপ চাপ কুয়াশা জমেছে। জমে জমে ঘন হয়েছে। দূরের কোন পুকুর পাড়ে মাটির পিদীম জ্বালিয়ে শ্মশান জাগিয়ে গেছে হয়ত, আবছা দেখা যাচ্ছে।

ক্ষেমী শীতে কাঁপছে। ঠকঠক করে কাঁপছে ত কাঁপছেই।

কাছের ঝুনো বটগাছটার গা বেয়ে জোনাক জ্বলছে। জ্বলছে, নিবছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে এপাশে ওপাশে। এখানে সেখানে।

একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। বটগাছের পাতা কাঁপল। শব্দ উঠল। তারপর যেমন তেমনই। শুধু অন্ধকার বাড়ছে। ক্ষেমী নিজেকেও স্পষ্ট দেখছে না। তবু সে এদিক-ওদিক তাকাল। কোথাও কাউকেই দেখল না।

ক্ষেমী হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। শরীর কুঁকড়ে গেল ভয়ে। শির শির করে উঠল সারা দেহ। এখন কি হবে? হাঁড়ি ভর্তি ঝুড়িটার তোড়ায় এক বার হাত রাখল। একটি টানও দিল। শব্দ করে কয়েকটা হাঁড়ি সরে গেল। ক্ষেমী সেগুলোকে আবার সাজিয়ে দিয়ে শামুক ভর্তি হাঁড়িটাকে মাঝ খানে বসিয়ে দিলে। দিয়ে নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলে। ক্ষেমী জানে, কেউ না কেউ আসবেই। এই সাঁঝ সকালে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে, ক্ষেমীর মন মানল না। তাছাড়া সে ত এপথে এই প্রথম নয়। গত আট বছর ধরে এপথে হাঁড়ি নিযে যাওয়া আসা করছে। অবশ্য আজকের মত একলা নয়। অন্য অন্যদিন হাঁড়ি বেচুনীদের অনেকেই থাকে। রাধার মা, বিনুদি, ঢেঙা পিসি, রাণু কাকী, চপলা, আরও অনেকে। আজ ভিন পাড়ায় হাঁড়ি বেচতে গিয়ে দেরী হল, ওরা সকাল সকাল চলে গেছে, অপেক্ষা করে নি। অথচ ক্ষেমী হলে অপেক্ষা করত, ঠায় বসে থাকত বেচা বিক্রি শেষ না হওয়া তক্। তা ওদেব সহ্য হয় নি হয়ত। হয়ত চোখ টাটিয়েছে। ক্ষেমী হাঁড়ি বেচে কুমোর পাড়ায় গেল, নতুন হাঁড়ি কিনল। তারপর ফিরতি পথে খুশিতে ডগমগ হয়ে শামুক খুঁজতে লাগল। এই শামুকেই হল কাল। হাঁড়িভর্তি ঝুড়ির কথা ভুলে গেল, বেলাব কথা ভুলে গেল, সন্ধ্যা তক পোড়ারমুখো হাঁস দুটোর জন্যে শামুকই খুঁজল।

এখন কি করবে ক্ষেমী?

ঝুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথা কুটতে ইচ্ছে হল ক্ষেমীর। ইচ্ছে হল কাঁদে। পোড়া কপালে এত দুঃখ, ক্ষেমীর অসহ্য। সে হাঁস দুটোর চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাল মনে মনে। মনে মনেই বললে, খাক শেয়ালে-শকুনে, মরুক মরুক, হাড়-মাস জুড়োয়। ক্ষেমী বিড় করতে করতে একটি লোক খুঁজছে। একটি মানুষ। জোয়ান না হোক, নিদেন একটি রোগা মানুষ।

ক্ষেমী কয়েক পা সামনে এগিয়ে কয়েক পা পেছনে গেল। না, কোথাও কেউ নেই, কেউ না।

একটা শেয়াল ডেকে উঠল। একটু পরে আরেকটা, অনেকগুলো।

ক্ষেমীর কেমন যেন ভয় ভয় লাগল।

সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই রাস্তার লোক একেবারে সাফ। অথচ এমন ত হয় না। শীতেও নয়, বর্ষায়ও নয়।

ক্ষেমী আশপাশের গাঁয়ের মানুষের উর্ধ্বতন তিন-চৌদ্দ বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার করল মনে মনে।

ক্ষেমীর শীত করছে। ভীষণ শীত। কাপড়টাকে আরো জোরে জড়িয়ে নিল গায়ে। অন্ধকার বাড়ছে। ঘন হচ্ছে।

ক্ষেমীর মনে হল এত শীত আর কোনদিন পড়ে নি, এত ভয়ও নয়। তার ইচ্ছে হল বসে—ভয় হল, যদি বসলে সে উঠতে না পারে? যদি দাঁড়াবার ক্ষমতাই ফুরিয়ে যায়? যদি...

হাঁটুর উপরে, বেশ উপরে হঠাৎ জ্বালা করে উঠল। কি হল হঠাৎ? ক্ষেমী কাপড়ের উপরে হাতটা রাখল। এবং হাত রেখেই চমকে উঠল। মুখে বললে মরণ! মরণ! পোড়ারমুখোর পিরীতের রকম দেখেই মরি!—বলতে বলতে হাতের তেলোয় থুথু ছড়িয়ে দ্রুত কাপড়ের তলায় হাতটাকে ঢুকিয়ে দিলে। কালো মোষে জোঁকটা মুঠো ভর্তি হয়ে গেছে রক্ত খেয়ে। বেশ বেগ পেতে হল ছাড়াতে। ছাড়িয়ে নিয়ে একবার চোখের সামনে তুলে ধরল। হাসল। তারপর সবেগে ছুঁড়ে দিল দূরে। যেখানে তখনো জ্বালা করছিল, যেখানে হাত বুলোলে বার কয়। এ পা ও পা ভাল করে একবার দেখল, শরীরটাও। তারপর ঝুড়ির পাশেই বসে পড়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজল।

বাড়ুক রাত। রাত বাড়লে ক্ষেমী কি করবে? হাঁড়িগুলোকে ত আর ফেলে যেতে পারবে না।

ওতো হাঁড়ি নয়, ক্ষেমীর পুঁজি।

ক্ষেমী বসে রইল।

ক্ষেমীর সোয়ামী আছে, কিন্তু সে ক্ষেমীকে পোছে না। ক্ষেমীর সোহাগের লোক ছিল, সেই কাঁচা বয়সে, সেও আছে, ক্ষেমীকে দেখলে এখন মুখ ঘোরায় ফিরেও তাকায় না। ক্ষেমী এখন একা। একেবারে একা। বছর তিনেক ধরেই একা। কেউ মুখ ঘুরিয়েও দেখে না।

ক্ষেমী কি মেয়েমানুষ নয়? কি নেই তার?

সব আছে, তবু যেন কিছুই নেই। কেন নেই? তার জন্যে কি ক্ষেমী দায়ী? ভগবান যদি মুখ ফেরাল ত মানুষ! আগের জন্মে পাপ করেছিল হয়ত, ক্ষেমীর বিশ্বাস, ভগবান তাকে এ জন্মে এমন শাস্তি দিয়েছে। নইলে তিন বছর আগেও তার কত কি ছিল।

মেয়ে মানুষের কত কি আবার থাকে যেন? কত আবার কি? এক রূপই ত একশ'। ক্ষেমীর রূপ ছিল।

সে বছরে মড়ক লাগল। মা শীতলার কৃপা হল। উজাড় হল গাঁ কে গাঁ।

কত মরল। ক্ষেমী মরে নি, কিন্তু মরারও বাড়া হয়ে গেল। মুখের রূপ গেল, একটি চোখ গেল। অমন যে গোল গোল হাত, সেই হাতের চামড়াগুলো কেমন যেন দলা পাকিয়ে গেল। গাল জুড়ল গর্তে। সর্ব অঙ্গে দাগ আর দাগ। ক্ষেমী মরতে চেয়েছিল; পারে নি।

পোড়ামুখো সুখ তাকে মরতে দিল না। সেই যে কবে সুখ পেয়েছিল, সুখ দিয়েছিল আবার পাবে, আবার দেবে, এ আশায় ক্ষেমী বেঁচে রইল। এখনো বেঁচে আছে।

এ কি আর বেঁচে থাকা?

রোদ জলে সারাদিন হাঁড়ির ঝুড়ি মাথায় এপাড়া-ওপাড়া ঘোরা, ভোরের রান্না বেলা ঢললে খাওয়া, আবার ঘোরা। বিক্রি হলে ত টেঁক ভারী, নয়তো খাটুনিই সার। এ আবার বাঁচা, না ছাই! এর চেয়ে মরণ ভাল, ঢের ভাল।

ক্ষেমীর মাঝে মাঝে এসব ছেড়ে ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে কি করবে সে? ধান ভানবে?

কার ধান ভানবে ক্ষেমী? ভানার মত ধান কি পাড়ায় আছে? সবারই ত কেনা চালে হাঁড়ি চড়ান।

ক্ষেমী নড়ে চড়ে বসল; তারপর কি এক ভীষণ অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল। একটি মানুষও কি আসবে না?

দূরে, অনেক দূরে হঠাৎ একটি আলো চোখে পড়ল। ক্ষেমীর মনের সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই গলায় এসে আটকে গেল। এবং সেই উত্তেজনায় সে ভূতো বটতলার বুড়ো শিবের থানে এক বাণ্ডিল মোমবাতিই মানত করে বসল। এক বাণ্ডিল মোমবাতির দাম কম করে সাত আনা। ক্ষেমীর দু'দুটো হাঁড়ির দামের সমান। আশ্চর্য, ক্ষেমীর সেকথা খেয়ালই হল না।

আলোটা মাঠ কোনাকুনি এগিয়ে আসছে।

ক্ষেমী আরো এক বাণ্ডিল মোমবাতি মানত করে বসল।

ক্ষেমীর মনে হল, আর তেমন শীত করছে না। মনে হল, অন্ধকার খুব ঘন নয়। মনে হল, রাতও এমন কিছু বেশী হয় নি।

ক্ষেমী হাঁড়িগুলোকে, উপরের হাঁড়িগুলোকে আরেকবার ভাল করে গুছিয়ে রেখে, নিজের কাপড়টাকে ভাল করে পড়ল। বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে ক্ষেমীর। হালকাও।

আলোটা এগিয়ে আসছে। ক্ষেমী আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

মাঠের মাঝ বরাবর এসে আলোটা বাঁক নিল। এ কী? আস্তে আস্তে আলোটা উপরে উঠল, আলের উপর। আলোটা এগোচ্ছে অন্য মুখে।

ক্ষেমীর শরীর আবার কেঁপে উঠল। জড়িয়ে ধরল হাড় কাঁপান শীত আর ভয় ধরান অন্ধকার। ক্ষেমী প্রাণপণে হাঁক দিল। এত জোরে হাঁক দিল যে, আলোটা থমকে গেল। ক্ষেমী আর একবার হাঁক দিল। তার গলাচেরা হাঁকে ফাঁকা থমথমে ভাবটা চিড় খেল ; অন্ধকার, কালো অন্ধকার নড়ে চড়ে আবার স্থির হল। আলোটা মাঠে নামল। আলোটা দুলছে।

ক্ষেমী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গা বরাবর এগোতে এগোতেই বেশ কাছাকাছি এসে লণ্ঠনের আলো আবার বাঁক নিল। ক্ষেমী নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। দেখছে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে, মাঠ থেকে সরকারী সড়কে। বার কয় আলোটা দুলল। তারপর, একটু উপরে, আরো উপরে উঠে লণ্ঠনের আলোটা ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে একবার নিবে গেল। আর একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষেমীর দেহের উপর, এক ঝাঁক ভয় ক্ষেমীর মনে। কিছুই দেখছে না সে, কিছুই শুনছে না, ঝিঁঝিঁর ডাক নয়, বাতাসের শব্দ নয়, শেয়ালের চিৎকারও না।

ক্ষেমী শক্ত হয়ে যাচ্ছে। কাছের বটগাছের গুঁড়ির মতো শক্ত। এবং ভয়ে সে ছোট হয়ে যাচ্ছে, গুটিয়ে যাওয়া শামুকের মতো ছোট্ট। ক্ষেমী দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বসে পড়ল।

ভূত নয় ত ?

যদি ভূত হয়, তা হলে ? তা হলে ক্ষেমীকে মেরে ফেলবে। কিন্তু ক্ষেমী, ক্ষেমী মরতে চায় না। কেন মরবে ? সে একটা হাঁড়ি হাতে তুলে নিল। শক্ত হাতে।

যদি মানুষ হয় ?

তা হলে। তা হলে মতলব কি ? বাতি নেবাল কেন ?

অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও দেখল একটি কালো ছায়া পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। কাছে, ভীষণ কাছে। ক্ষেমী হাঁড়ি হাতে উঠে দাঁড়াল।

কে রে ?

প্রথম কথাটা, গলায় আটকে গেল। পরে বললে, আমি, আমি ক্ষেমী।

ক্ষেমী !—লোকটার গলার স্বর হঠাৎ একেবারে খাদে নেমে গেল। মনে হল লোকটার সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। মনে হল, যেন অনেক

গুছন আশা পলকে মাটিতে পড়ে মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মনে হল, তার চোখে অন্ধকার একতিলও কমে নি, বরং বেড়েছে। বাড়ছে।

ক্ষেমী লোকটাকে চিনেছে। পোলের ধারের চা-দোকানী উপেন্দ্র। ক্ষেমীর মনে আর ভয়, বিন্দু মাত্র ভয় অবশিষ্ট নেই। স্নান শেষে কাকের ডানা ঝেড়ে জল ঝাড়ার মতো শরীরে একটা মোচড় দিয়ে ক্ষেমী একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল। সহজ।

বউ বুঝি তাড়িয়ে দিলে গো? ক্ষেমী তরল কণ্ঠে শুধল।

বউটার অসুখ। মনটা ভাল নেই।

থাকবার কথাও নয়। ক্ষেমী মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে জিজ্ঞেস করল, জ্বর-জ্বারি বুঝি'?

ওই আর কি।

মেয়েটা ভাল ত?—ক্ষেমী শুধল।

কই আর ভাল! সেটাও কাশছে।

ক্ষেমী বোঝালে বাঁচার আর সুখ নেই। অসুখ-বিসুখ ঘরে ঘরে। এ সংসারে সুখ নেই, শান্তি নেই, কিচ্ছু না।

দোকানী নিস্পৃহ গলায় শুধল, এত রাত হল কেন রে?

শামুক খুঁজছিলাম।

অ—দোকানী হাসল। গলার স্বরে একটু শ্লেষ মিশিয়ে বললে, এমন শামুক খুঁজলি যে বেলা তক্ ঠাওর হল না।

মরণ আমার!

হ, তোর মরণ বৈকি। কথা বলতে বলতে ঘাড় ঘুরিয়ে দোকানী যেন অন্ধকারে রঙটাই ভাল করে পরখ করলে।—বড্ড আঁধার না?

ক্ষেমী বললে—হুঁ।

বাড়ী পেঁছিতে অনেক রাত হবে।

দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে। এই কপালের লিখন ছিল যে। ক্ষেমী আঙুলে কপাল ঠুকতে ঠুকতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

দোকানী এতক্ষণে হাতের লণ্ঠনটা মাটিতে রাখল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল বিড়ি আর দেশলাই। একটি বিড়ি ক্ষেমীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নে, খা। দোকানী বিড়িতে আগুন দিলে। নিজের বিড়িতে এবং ক্ষেমীর বিড়িতে। সেই আগুনের আলোয় ক্ষেমীর মুখটা একবার দেখে

নিল।

দিনের বেলায় ক্ষেমীর মুখ যত খারাপ দেখায়, এখনকার মুখের চেহারা তেমন খারাপ লাগল না দোকানীর।

দোকানী বিড়িতে বারকয় জোরে জোরে টান দিলে।

ক্ষেমীও টানলে বার কয়।

একজোড়া বিড়ির আগুন মুখোমুখি জ্বলছে।

দোকানী বললে, বীড়াটা পাকিয়ে নে।'

—এই নিই।

ক্ষেমী বিড়িতে আরেকবার টান দিলে জোরে। দোকানীও।

দুই হাতে বীড়া পাকাচ্ছে ক্ষেমী। পাকান শেষ। এখন ক্ষেমী প্রস্তুত। দোকানীও।

দোকানী ঝুড়ির তোড়াতে হাত দিল। ক্ষেমীও দিল।

দোকানী ক্ষেমীকে দেখার চেষ্টা করছে। ক্ষেমী দোকানীকে। কেউই কাউকে স্পষ্ট দেখছে না। ক্ষেমী বললে, মৃদু গলায় বললে, তুলে দাও।

—এই দিই।

ঝুড়ির তোড়া ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ক্ষেমীর মাথার বীড়া মাটিতে পড়ে গেল। বীড়া খুলে গেল।

এই যা!—দোকানী তোড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুট্ কাটল,—হল ত। দোকানী হাসছে।

ক্ষেমী দ্রুত হাতে আবার বীড়া পাকাতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর তেমন হচ্ছে না। কিছুতেই না। তবু ক্ষেমী বার বার খুলে বার বার পাকাচ্ছে।

দোকানী দেখল, সমস্তই দেখল। দোকানীর ভীষণ পেট টাটাচ্ছিল। সে পায়ে পায়ে সরে গেল রাস্তার ওপাশে।

ক্ষেমী ফিক্ করে হাসল।

দোকানী ফিরে এসে শুধল, তোর হল?

দূর—ক্ষেমী ঠোঁট উল্টিয়ে জবাব দিলে।

—দিলি ত দেরী করে। দোকানী কথা বলতে বলতে এক ঝটকায় বীড়ার কাপড়টা ক্ষেমীর হাত থেকে নিয়ে পাকাতে লাগল।

ইতিমধ্যেই দোকানী ক্ষেমীর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। এবারে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ভেজা কাপড়ের ঘ্রাণ থেকেই বুঝলে হয়ত, শুধলে, কাপড় ভেজা কেন রে ?

পা পিছলে জলে পড়েছিলুম যে।

দোকানী ক্ষেমীর কাপড় কতটুকু ভিজেছে পরখ করার জন্যে ক্ষেমীর গায়ে হাত দিল।

দোকানী কাঁপছে।

ক্ষেমী আড় চোখে একবার দোকানীকে দেখল। বীড়ার কাপড়টা পড়ে গেল দোকানীর হাত থেকে।

ক্ষেমী কাপড়টা তুলতে ঝুঁকল, তুললও। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দোকানী দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল ক্ষেমীকে।

—কর কি, কর কি ? ক্ষেমী হাতের বাঁধন ছাড়াতে চাইল। পারল না। দোকানী আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ক্ষেমীর ভাল লাগল। তবু মুখে বললে, লোক আসে যে !

দোকানী হাতের বাঁধন একটু ঢিলে করে মুখ তুলল, কোথায় ?

ওই যে।

অনেক দূরে একটি লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে।

ওই লোক! দোকানী হাসতে হাসতে ক্ষেমীকে বুকের ভিতর নিয়ে এল। আদর করে কানে কানে বললে—এদিকে আসবে না।

ক্ষেমী আর কোন কথা খুঁজে পেল না বলার। না তা নয়, ক্ষেমী ইচ্ছে করেই আর কোন কথা বললে না। না, তাও নয়, ক্ষেমীর কোন কথাই বলতে ইচ্ছে করল না।

ক্ষেমী বোবা হয়ে গেছে। সুখে বোবা।

বীড়া পাকাতে এক মিনিটও লাগল না ক্ষেমীর। দোকানীরও ভীষণ তাড়া। অতএব—

হাঁড়ি ভর্তি ঝুড়িটা তাড়াতাড়ি ক্ষেমীর মাথায় তুলে দিয়ে দোকানী হন হন করে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথেই চলতে লাগল। ক্ষেমী হাসল মনে মনে। বললে, তোর লজ্জার মুখে আগুন। লাজ না, ছাই। জানাজানি হবার ভয়। কুত্তা কোথাকার। ঘেয়ো কুত্তা।

ক্ষেমী বাড়ী যাচ্ছে।

বাড়ি গিয়ে ক্ষেমীকে রান্না করতে হবে না। সকাল বেলার তরকারী তোলা আছে। গরম করে নিলেও হয়, না নিলেও চলে যাবে। আর এবেলার চাল? সে ত মধুর মাকে দেয়া হয়েছে। ও ঠিক রান্না করে রাখবে।

মধুর মা কি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে? ঘুমুক। জাগিয়ে নিলেই হবে। ক্ষেমী তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই একটি হোঁচট খেল। হাঁড়িশুদ্ধ পড়ছিল আরেকটু হলে, খুব ভাগ্যি যে বেঁচে গেছে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। এবং মনে পড়ল দোকানীকে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল যে, হয়ত দোকানী তার নাম করছে, যার জন্যে সে হঠাৎ হোঁচট খেয়েছে। ক্ষেমীর গাল দিতে ইচ্ছে হল, দিলও।

ক্ষেমী কালাপোল পেরিয়ে, সুলতান মিঞার বাঁক, স্কুল, পোস্টাপিস ছাড়িয়ে মাদ্রাসার কাছাকাছি এসে গেছে। পরের বাঁকে রামকানাইয়ের দীঘি, দীঘি ছাড়ালেই ক্ষেমীদের পাড়া।

বাঁকটা ঘুরল। দীঘির পাড়।

অন্ধকারেও চিক্ চিক্ করছে দীঘির জল। ক্ষেমী দেখল আকাশ ডুবে আছে দীঘির জলে। ক্ষেমী দেখল তারাগুলো সাঁতার কাটছে জলে। কাটুক। ইচ্ছে হল ক্ষেমীর সাঁতার কাটে। হঠাৎ মনে পড়ল শীতের কথা। অনেকক্ষণ পরে তার শীত শীত করল। তার ইচ্ছে হল আকাশ দেখে। ঝুড়ি আড়াল করেছে আকাশ। আড়াল করুক, ক্ষেমীর তাতে কিছুই যায় আসে না। সে তো মুখ তুলে নয়, চোখ নামিয়েই আকাশ দেখছে দীঘির জলে। আকাশ ঠিক নয়, আকাশের তারা। সেও বা কম কি!

ক্ষেমী পাড়ার মধ্যে ঢুকল। সরু পথ, দুধারে গাছের সার। অন্ধকার এখানে আরো ঘন, গাঢ়। ক্ষেমী হাঁটছে ধীরে, ভাবছে দ্রুত।

আগামী কাল সে কম করে দুটো হাঁড়ি গছাবে দোকানীকে, এবং এক কাপ চা খাবে, না বিস্কুট দিয়ে নয়, তেলতেলে কাগজে মোড়া কেক দিয়ে। খাবে ঢেঙা পিসীদের সামনেই, বিনুদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে। নিশ্চয়ই বিনুদির চোখ টাটাবে, ভাববে, ক্ষেমী কি মন্তর করল গো দোকানীকে? ক্ষেমীর তাতে ভীষণ সুখ হবে। আর হাঁ, একটি পান খাবে দোক্তাপাতা দিয়ে। একটি বিড়িও।

ক্ষেমী আরেকবার হোঁচট খেল। বড্ড যন্ত্রণা হল এবারে ক্ষেমীর। আর তাই সে দোকানীকে আরেকবার গাল দিলে।—মরণ মিনসের, আবার মনে করে!

মুখে আগুন। মুখে আগুন!—বলতে বলতে বলতে সে মনে মনে একেবারে পাকাপাকি করে নিলে—না, কিছুতেই সে দোকানীর সামনে যাবে না। কাল থেকে অন্য দিকে হাঁড়ি বেচতে যাবে সে। উল্টোদিকে।

ক্ষেমী বাড়ি পেঁছিল। পেঁছেই হাঁসের খোঁয়াড়টা দেখল। মধুর মা দরজা দিয়ে দিয়েছে। ক্ষেমী খুশী হল।

চারদিক নিঃঝুম। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। একটি জোনাকি উড়ে উড়ে জ্বলছে-নিবছে পেয়ারা গাছের ডালে। দূরের ছাইগাদায় মাদীকুত্তিটা কুঁই কুঁই করে উঠল বার কয়। অনেক দূরে শেয়াল ডাকল। কতগুলো কুকুর আরো দূরে ঘেউঘেউ করে উঠল। উঠোনময় অন্ধকার। ঘরগুলোতেও। সবাই ঘুমুচ্ছে।

ক্ষেমী মধুর মার দরজায় ধাক্কা দিল।

মধুর মা জাগল। দরজা খুলল। ঝুড়ি নামাতে নামাতে শুধল, এত রাত কেন রে?

—পোড়া কপালের দুঃখ ··

মধুর মা কথার মাঝখানেই বলল, অ—বলেই পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভাতের হাঁড়িটা ক্ষেমীর দাওয়ায় রেখে, ঘরের দরজা দিলে।

ক্ষেমী তালা খুলে কেরোসিনের কুপি জ্বালাল। কাপড় ছেড়ে ভাত খেল। বিড়ি টানল। তারপর ক্ষণকয়েক এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখল, ক্ষেমীর সোয়ামী ঘরে ফিরে ক্ষেমীকে ডাকছে। সে তবুও উঠছে না। সোয়ামী তাকে অনেক সোহাগ করে চুমু খেল। সোহাগে ঢল ঢল হয়ে জাপটে ধরল। তবু ক্ষেমী উঠল না। ক্ষেমীর সোয়ামী তাকে তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে, মাঠে। ক্ষেমীর ভীষণ রাগ হল। ঘরের বউকে কেউ বাইরে নিয়ে যায় নাকি! আদিখ্যেতার বহর দেখে ক্ষেমী নিজেকে ছাড়াবার জন্যে মোচড় দিতেই পলকে দেখল, লোকটা তার স্বামী নয়, দোকানীও নয়, সেই কাঁচা বয়সের পিরীতের মানুষটিও নয়, এ অন্য আরেকজন। ক্ষেমী একে দেখে নি, একে চেনে না। ভাল করে তাকাতে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও কেউ নেই। ঘরে সে একা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাক চাক রোদ্দুর গড়াচ্ছে মেঝেয়। ক্ষেমী তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাইরে এল। একজোড়া চড়ুই শনের চালার ভেতর থেকে কিচির মিচির শব্দ করে বেরিয়ে গেল। ক্ষেমী দেখল। সারা শরীরে মোচড় দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বাব্বা,

কি ঘুমই না ঘুমিয়েছে সে।

সে এলোচুল গুছিয়ে খোঁপা বাঁধল। তারপর খুঁটি ধরে দাঁড়াল সোজা হয়ে। উঠোনময় রোদ্দুর। মধুর মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। নন্দা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বেগুন কুটছে। নন্দার মা রোদ্দুরে পিঠ পেতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পান্তা গিলছে। ক্ষেমী দেখছে, শিউলি গাছের ডাল বেয়ে ওঠা তেলকুচার লতায় ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে। ঝিঙেফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। মাচানের গা বেয়ে ঝুলে পড়েছে লাউডগা, শশার ডগা। ওপাশের সুপুরী গাছের মাথায় ফড়িঙ উড়ছে। গোয়াল ঘরের চালায় বসে ডাকছে একটা কাক। মধুর মা ঝাঁট দিচ্ছে। ধুলো উড়ছে। উড়ুক।

ক্ষেমীর সেদিকে খেয়াল নেই। মধুর মা আড়চোখে ক্ষেমীকে দেখছে।

ক্ষেমী উঠোনে নামল। খোঁয়াড়ের দরজা খুলবার জন্যে দাওয়ায় হাত রেখে ঝুঁকল। দরজাটা খুলে দিল। একটি হাঁস হেলে দুলে শব্দ করে বেরিয়ে এল। ক্ষেমী ধমকের সুরে আরেকটাকে তাড়া দিলে। তাড়া দিতে দিতেই হাঁটু মুড়ল, আরো ঝুঁকল। মধুর মা ওদিক থেকে বললে—তোর হাঁসাটি কাল ফেরে নি রে।

কি? ক্ষেমী মাটিতে ঝুঁকে খোঁয়াড়টা দেখল। এ কী! একটি ডিম পড়ে রয়েছে খোঁয়াড়ে। সুখে, না দুঃখে ক্ষেমীও জানে না, ক্ষেমী ধুলোর উপরই বসে পড়ল। নড়ল না, চড়ল না, স্থির বসেই রইল।

মধুর মা ঘরে ঢুকে গেছে। নন্দাও। নন্দার মা বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছে। ক্ষেমী বসে আছে।

ক্ষেমীকে ওভাবে বসে থাকতে দেখেই হয়ত হাঁসটা আবার হেলে দুলে শব্দ করতে করতে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ক্ষেমী দেখছে, হাঁসটা আস্তে আস্তে ডিমটার উপর গিয়ে বসল। এবং বসেই রইল। ক্ষেমী দেখছে, পালকের তলা দিয়ে ডিমের সাদা একটু অংশ। ক্ষেমীর কি যেন হয়ে গেল। কেমন যেন মনে হল তার। আর তাই সে মমতায় স্নিগ্ধ এক কোমল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল হাঁসটার দিকে, ডিমটার দিকে, এবং খোঁয়াড়ের দরজা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়া এক ঝলক উজ্জ্বল রোদ্দুরের দিকে। ক্ষেমী ঘামছে। ভীষণভাবে ঘামছে॥

দেশ/৭ ফাল্গুন ॥ ১৩৬৬

কাকপক্ষী জাগার আগে সে আরেকবার জাগল। ঘরে তখনো ডাঁই করা অন্ধকার। সে কিছুই দেখল না, তবু সে গোপলার মাকে একবার ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। সে আরেকবার ডাকল। না, সবাই ঘুমে। সে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। বালিশ দুটোকে কোলের উপর টেনে নিলে। দম ফেললে বার কয়। ভাবলে আরেকবার ডাকে, তার আগেই মুসলমানপাড়ায় মোরগ ডেকে উঠল। সে কান পেতে রইল। একটি কাক ডাকল চালার উপরের আকাশে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তা হলে ভোর হচ্ছে। সে ভাল করে ঘরের ভেতর তাকাল। না অন্ধকার কমছে। বেড়ার ফাঁকে ফোকরে ধোঁয়া ধোঁয়া আলো। একটু পরেই ঘরে ঢুকে অন্ধকার মুছে নেবে। ভোর হবে।

অ গোপলা, অ সাবিত্রী—সাবিত্রী—আ মলো, আরে ভোর হয় যে! ওঠ না, অ সাবিত্রী, অ গোপলা,—

কেউই সাড়া দিল না। হেতমপুরের কাঁটাবক্র ওরফে ভানুদাসের ইচ্ছে হল বালিশ ছুঁড়ে মারে; পারল না। দু হাতে বিছানার পাশে পড়ে থাকা লাঠিটা খুঁজল; পেল না। একটা টিনের বাটি হাতে ঠেকল। সেটা ছুঁড়ে মারল বেড়ায়। বাটিটা ছোট্ট শব্দ করে গড়িয়ে গেল, কেউ জাগল না। সে রাগে, ক্ষোভে বিড় বিড় করে বকল। বললে—ধেত্তেরি শালার বাচ্চা, বউ। মরেছে বুঝি! জাহান্নামে গেছে? উলাউটো হয়েছে?

সে আবার আগের মতই বসে রইল।

বেড়ার ফোকর দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘর, ঘরের ভেতরের মানুষ। বাইরে বেয়াড়া কাক ডাকছে, গা ঝাড়া দিচ্ছে নেড়ীকুত্তা-গুলো। পায়রাগুলো বকছে খোপে, মোরগ ডাকছে।

পাশের বাড়ির দরজা খোলার শব্দ উঠল।

নিশ্চয়ই কানুর বউ উঠেছে।

দক্ষিণের গোয়াল ঘরে একটি গরু ডেকে উঠল। ভানুদাস ভাল করে শুনল। আবার গরুটা ডাকল।

হু ঠিক ধরেছে। বিনুবুড়ীর গাই। কিন্তু ডাকছে কেন? এইত সেদিন গাইটাকে পাল খাইয়ে আনল ভানুদাস। তাহলে? মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে মনে মনে বললে—বুড়ির কপালটাই মন্দ।

ভানুদাস পায়ের শব্দ শুনল।

নিশ্চয় কানুর বউ বাসন নিয়ে পুকুরে যাচ্ছে। নইলে এমন থপ্ থপ্ করে পা ফেলে, মাটি কাঁপিয়ে হাঁটবে কে এ বাড়িতে? বউটা বড় মন্দাই। মন্দা হবে নাই বা কেন? সাত বছর বিয়ে হল, একটিও ছেলে বিয়োলে না। ছেলে না বিয়োলে মেয়েমানুষ গতরে বাড়ে। গতরে বাড়লে চলন বলন একটু বেহিসেবী হবেই।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

গাইটা একনাগাড়ে ডাকছে।

আহা! বুড়ী খুব বিপদে পড়বে। কে নিয়ে যাবে ওই গাইটাকে। কানু যাবেই না। পরাণের দিনমজুরী, সে একটু পরেই চলে যাবে। রাখালদের কেউ-ই বাড়ি নেই। গোপাল? ও পারবে কেন? গরুটা বেয়াড়া ডাকছে। আশ্চর্য, তবু ঘরের মানুষগুলো জাগছে না। ভানুদাসের ভীষণ রাগ হল। এবং রেগে গিয়ে আবার ডাকতে লাগল—অ গোপলা, অ সাবিত্রী।

এক সময়ে সাবিত্রীর ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া ভেঙে, কাপড় সামলে উঠে দরজা খুলল। একঝাঁক আলো ঢুকে ছোট্ট ঘরটাকে একেবারে ধুয়ে দিলে। ভানুদাস দেখল ভেতর উঠোন, রান্নাঘরের শণের চালের উপরে হেলে পড়া বকফুল গাছের ডালটা। অনেক ফুল ফুটেছে, ছড়া হয়েছে, কলিও আছে অনেকগুলো।

অ সাবিত্র।!

ভানুদাসের বউ, গোপলার মা সাবিত্রী দাওয়া থেকেই ফিরে তাকাল। তাকানোর রকম দেখে হঠাৎ ভয় পেল ভানুদাস। এবং যা বলতে যাচ্ছিল তা না বলে, ভীষণ কাচুমাচু গলায় শুধল—সূর্য উঠেছে বুঝি?

না। সাবিত্রী ভেতরের উঠোনে পা দিল।

ভানুদাস ডাকল—অ গোপলা, গোপলারে, ওঠ। ওঠ না।

গোপলা পাশ ফিরে শুল।

সারারাত ভাল করে ঘুমুতে পারে নি ভানুদাস। কতবার যে ঘুম ভেঙেছে,

মনে হয়েছে, এই বুঝি ভোর হল, কাক ডাকল, লোক জাগল। কাক ডাকে নি, লোক জাগে নি, ভোর হয় নি। ভানুদাস আবার ঘুমুতে চেষ্টা করেছে। কতদিন পরে ভাত খাবে সে। পুরো একুশদিন ত জ্বরেই ভুগল। দু'দিন রইল সেই একই পথ্যি খেয়ে। পরশু আর গতকাল খেয়েছে জাউভাত। আজ ভাত খেতে বলেছে কোবরেজ। মাছের ঝোল আর ভাত।

অ গোপলা!

গোপলা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল। চোখ রগড়ে শুধল, কি?

গতকাল বলেছিলাম যে—

কি?

সেই উত্তরের বিলের খাইয়েতে—

অ!—গোপলা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

ছেলের তাড়াহুড়ো দেখে ভীষণ খুশী হল ভানুদাস। ছেলেটা মায়ের মতন নয়। দারুণ চটপটে। ভানুদাস মনে মনে ছেলের প্রশংসা করল। গোপলা বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

ঘর এখন খালি। বেড়ার ধারে রাখা কলার কাঁদিটা স্পষ্ট দেখছে ভানুদাস। গতকাল বিনুবুড়ীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে সাবিত্রী। কলা আর মাছ দিয়ে ঝোল হবে। কিন্তু সে কখন? গোপলার মা সেই যে সরে পড়ল এখনো দেখা নেই। কোথায় গেল গা? পুকুরে কি? কিন্তু পুকুরে এতক্ষণ কি করছে সাবিত্রী? কখন মসলা পিষবে, হলুদ বাটবে, কলা কুটবে, উনুন ধরাবে? কখনই বা চাল ফুটবে, ঝোল রাঁধবে? সে কখন?

অ সাবিত্রী।

কোথায় কার সাবিত্রী। নিরুপায় ভানুদাস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাইরে তাকাল। বকফুলের হেলান ডালটায় রোদ এসে পড়েছে। ছোট্ট ছোট্ট পাতাগুলো বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে। দুলছে থোকা থোকা ফুল আর লম্বা লম্বা ছড়া। ঝুপ করে একটা কাক এসে বসল ডালে। রাতের হিম জমে জমে শিশির হয়েছিল ভোরেই, হঠাৎ ঝাঁকুনিতে তার কয়েক ফোঁটা ঝরে পড়ল, কয়েকটা হলদে হয়ে যাওয়া পাতাও। ডালটা এখনো কাঁপছে। কাঁপুক।

ভানুদাস চোখ নামাল।

রান্না ঘরের চালাটা একেবারে গেছে। বর্ষার আগেই একবার চালে শন দিতে হবে। নইলে যাবে, সব যাবে।

গোপলা এসে ঘরে ঢুকল।

কি রে, গেলি না?

এই যাই।

হ যাই। সূর্য বলে মাথার উপর উঠে গেল। আর গেছিস্‌।

গোপলা কিছু না বলে আধছেঁড়া গামছা হাতে বেরিয়ে গেল। পায়ের শব্দের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে রইল ভানুদাস। নিশ্চয়ই ঢেঁকি ঘরে ঢুকেছে গোপলা। জালটা নেবে, ডুলাটা নেবে, তারপরে যাবে।

কি হচ্ছে রে গোপলা? সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর।

উত্তর বিলের খাইয়েতে মাছ মারব।

এই ভোরে! তোদের হয়েছে কি শুনি?—সাবিত্রী হাতে কপাল চাপড়াতে লাগল। বললে, আমার কেন মরণ হয় না। এই সাত সকালে মুখে কিছু না দিয়ে ছেলে আমার মাছ মারতে চলেছে। বলি, সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে?

ঐ শোন। ভানুদাসের সমস্ত শিরা উপশিরা মুহূর্তে জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল তেড়ে গিয়ে দু'চার ঘা লাগিয়ে দেয় সাবিত্রীকে। যত সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আর এদিকে আমি মানুষটা পঁচিশ দিন না খেয়ে আছি সেটা কিছু না, ছেলে ভোরে কিছু মুখে দিল না ওটাই যেন সব। এই মুহূর্তে সংসারের উপর ভীষণ ঘেন্না ধরে গেল তার। ইচ্ছে হল মরে সব জ্বালা জুড়োয়। কিন্তু সে কি করে সম্ভব? মরার জন্যেও ত জোর চাই, একটু জোর। ঘরে ত আর মরা চলে না।

ঠিক আছে, গায়ে একটু জোর হলেই সে মরবে। তার আগে—সাবিত্রী গোপলাকে আরেকটা ধমক দিল। ভানুদাসের মনে হল, গোপলা জাল ডুলা ছুঁড়ে ফেলে দুমদাম শব্দে বেরিয়ে গেল।

অ সাবিত্রী।

সাবিত্রীর কানের বালাই। সে ততক্ষণে ছেলের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে। বকছে. বলছে—মর, মর। দেমাক দেখ না ছেলের। ভোর সকালে মাছ মারবে? বলি, মাছ ক'মন লাগবে রে হাভাতে ছেলে?

ভানুদাস আরেকবার ডাকল।—অ গোপলার মা।

গোপলার মা তখন বাইরের উঠোনে।

খালি ঘর। ঘরে ভানুদাস্‌ একা।

উঃ লাঠিটা, আমার লাঠি।—ভানুদাস আশেপাশে তাকাল। নেই, কোথাও

নেই। ওপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল। বাঁশে টাঙিয়ে রেখেছে। দাঁড়ালেই নেয়া যাবে। ভানুদাস গায়ের কাঁথাগুলো ফেলে দিলে। হামা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল বেড়ার ধারে। ধীরে ধীরে সে দাঁড়াতে চেষ্টা করল বেড়া ধরে। সে দাঁড়াল।

আ, কতদিন পরে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। যেন এক যুগ। তার গা কাঁপছে, পা তুলতে পারছে না। মনে হচ্ছে পা বাড়ালেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। সে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

কাঁপুনি কমল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার ভয়ও। সে পা বাড়াল। এক পা। আর এক পা। ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢুকল সাবিত্রী। চোখ পাকিয়ে 'আমার কি হবে গো' ব'লে আচমকা ডুকরে উঠল। পড়তে পড়তে হঠাৎ বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ভানুদাস। মুখে বললে—লাঠিটা।

গোপলার মা তাড়াতাড়ি লাঠিটা ভানুদাসের হাতে দিয়ে মেঝেয় বসে মাথা কুটতে লাগল। ভানুদাসের ইচ্ছে হল কষে লাগিয়ে দেয় লাঠির এক ঘা। দিল না। সাবিত্রী ততক্ষণে সুর করে চেঁচাচ্ছে—হা ঈশ্বর! আমার কেন মরণ হল না, ওলাউঠো হল না; আমি কেন মরলাম না। এসব দেখতে কেন বাঁচিয়ে রাখলে গো।

ভানুদাস লাঠিতে ভর দিয়ে, নিজের সমস্ত শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল—চুপ র।

মুহূর্তে মূক হয়ে গেল সাবিত্রী। এই ভানুদাসকে সাবিত্রী চেনে। সাবিত্রীর মনে পড়ে গেল বন্দুক হাতে ভানুদাসকে। যে শুধু কাঠবেড়ালী নয়, জলজ্যান্ত মানুষও বুঝি খুন করতে পারত তখন।

ভানুদাস ধীরে ধীরে দাওয়ায় গিয়ে, বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

এখান থেকে অনেকটুকু দেখা যায়। পাশাপাশি বাড়ির ভেতরের উঠোন, কানুদের ঝিঙের মাচান, পরাণের পেঁপে গাছ, রাখালদের পুঁইলতা, বিনু-বুড়ীর ঝাঁকড়া কুলগাছ, অনন্তদের বারোমেসে বেগুনের ক্ষেত। আর দেখা যায় দক্ষিণের মাঠ, মাঠ শেষের হিজল বেতের জড়াজড়ি করা কালোকুলো পাতা, হিজলের ডাল, আরো দূরের ঢেঙা ঢেঙা দু-পাঁচটে তালগাছ। উত্তরের দিকটাতে কয়েকটা আমের গাছ, একটি সজনে গাছ, তারপরেই বিঘে কয় ছায়াতলী জমি। পাশেই আলপথ, পথটা বদ্যিদের সড়কে গিয়ে মিশেছে। এ বাড়ির সবাইকে ও-পথ দিয়েই বেরোতে হয়।

ভানুদাস চোখে হেঁটেই অনেকদূর ঘুরে এল। একটু খুশী হল। একটা চড়ুই বেরোল রান্নাঘরের চালা থেকে। ভানুদাসের চোখ গেল সেদিকে। একটু রাগ হল। শালার চড়ুইগুলোও পেছনে লেগেছে। সব্বোনাশ না করে ছাড়বে না। মনে মনে গাল দিল। তারপরেই তার চোখ গেল চালের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপরে ওঠা সুপুরী গাছের মাথায়। ডালগুলো চিক্ চিক্ করছে। চোখ গেল সুপুরীর থোকায়। রোদের ফুল ধরেছে যেন। কতক্ষণ অনিমেষ তাকিয়ে রইল।

লাল লাল সুপুরীগুলোতে রোদ পড়ে বেশ দেখাচ্ছে। ভীষণ লাল। ভানুদাসের মনে হল, সোনার চাইতেও সুন্দর ওগুলো। ব্যস্ ওই পর্যন্ত। আর কিছুই মনে হল না তার। কিচ্ছু না। অথচ তাকে সবাই ভয় করে। এমন কি গোপলার মাও। কিন্তু কেন করে?

গোপলার মা, ভানুদাসের স্ত্রী সাবিত্রীর ভয় অকারণ নয়। লোকে এমন কি বাড়ির লোকেও বলে ভানুদাসের নজর খারাপ। সত্যি, নজর খারাপ না হলে লোকে মন্দ বলবে কেন? কেউ ত আর শত্তুর নয়। তাহলে?

ভানুদাস বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ বোঝে নি। একে একে খদ্দের সব চলে গেল কেউ আর ভানুদাসকে কাঠবেড়ালী মারতে ডাকে না। পাড়ার, ভিন পাড়ার কেউ না। ডাকবে কেন? সাবিত্রী শুনেছে ভানুদাস কাঠবেড়ালী মারতে গিয়ে কাঠবেড়ালী না খুঁজে, কোথায় কার ক্ষেতে কি বেশী ফলছে তাই খুঁজে বেড়ায়। কারো ক্ষেতে কুমড়ো ধরেছে, ভানুদাস কাঠবেড়ালীর খোঁজে সেখানে। অথবা কারো চালে বড় বড় লাউ ধরেছে, ভানুদাসের চোখ তক্ষুণি আটকে যাবে চালে। বারমেসে বেগুন, বিলেতী লঙ্কা, ঝিঙে, উচ্ছে কোন কিছুই ভানুদাসের নজর এড়াবে না। লোকে বলে—শালার চোখ ত নয়, বটের আঠা।

ভানুদাসের তাকানর ঢঙটাই নাকি বিশ্রী। লোকে বলে, তখনকার চোখের অবস্থা দেখলে মুচ্ছো যেতে হয়। উঃ সে কি চোখ। কোটর ঠেলে পুতলী দুটো বেরিয়ে আসে, চক চক করে কালো মণিজোড়া, যেন গিলছে। তখন কোথায় তার গাদা বন্দুক, কোথায় কাঠবেড়ালী। আশেপাশে বাড়ির লোকজন থাকলে বেশ কুঁজো হয়ে সবিনয়ে বলে—বড় ফলন হয়েছে গো, দেখেও সুখ। একটু থেমে নিবেদন করে,—তা গরীবকে একটা আধটা দেবেন, একটু স্বাদ নেব। দেবেন ত? ব্যস্, হয়ে গেল ফলন। চোখের সামনেই পচে গলে পড়বে না।

ভানুদাস এসব অস্বীকার করে। তবু তার নামে অনেক রটনা রটেছে মুখে মুখে। লোকে বলে,—শালা কাঁটা, কাঁটা, সব সুখের কাঁটা।

লোকে ভানুদাসকে দিয়ে কাঠবেড়ালী মারা বন্ধ করলে। রাগে ক্ষোভে সে তার অতি সাধের গাদা বন্দুকটা বেচে দিলে। দিনমজুরী করবে ভানুদাস। ক্রমে খাটনি বাড়ল। কুঁজো হয়ে গেল। লোকে বলল—কাঁটাবক্র। তারপর দিন গেছে, মাস, বছর। কতকিছু ভুলে গেছে মানুষ, কত ঘটনা, কত রটনা। কত মানুষ মরে গেছে, কতজনকে ভুলে গেছে, কিন্তু ভানুদাস কাঁটাবক্র রয়ে গেছে। সে কাউকে বোঝাতে পারে নি, কেউ বুঝতে চায় নি যে, তাদের ধারনা ভুল। মিথ্যে, মিথ্যে। এমন কি বউ সাবিত্রীও নয়। তাকে দু দুবার বন্দুক তাক করে শাসিয়েছে ভানুদাস। ভয়ে ভয়ে সাবিত্রী বলেছে—মিথ্যে, হ্যাঁ মিথ্যে। কিন্তু ভানুদাস জানে, সাবিত্রীও মনে মনে বিশ্বাস করে। ভানুদাস রাগে দঃখে চুল ছিঁড়েছে, তবুও কেউ বিশ্বাস করে নি। এখনো লোকে দেখলে সেই পুরোন কথার জের টানে, তেমনি করে সখের জিনিষ আড়াল করে। বাড়ির আশেপাশে হাঁটলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভানুদাস একে একে সব ছেড়েছে। এখন বাড়ি আর কাজ, কাজ আর বাড়ি। কারো বাড়িতে যায় না ভানুদাস। সে যাবে না, কিছুতে না। গোপলার মাও বলেছে—গিয়ে কাজ নেই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ ঘরের কাজে মেতে আছে। ভানুদাস সেই থেকে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে ত আছেই। ক্রমে রোদ্দুর বাড়তে বাড়তে চালা ঢেকেছে, চালা গড়িয়ে ভেতরের উঠোন, দাওয়া। ভানুদাস বসেই আছে। ইতিমধ্যে বার দুই পুকুরে গেছে সাবিত্রী, একবার বাসন কোসন নিয়ে, আরেকবার চাল আর কোটা তরকারী হাতে। কানে শুনেছে লঙ্কা হলুদ বাটার শব্দ। এক সময়ে রান্নাঘরের ধোঁয়া বাইরে এসেছে। ভানুদাস বুঝেছে আগুন পড়েছে উনুনে।

রান্নার কাজ একমেটে করে বাইরে এল সাবিত্রী। গোয়ালে যাবে, ধান ছড়াবে উঠোনে। ভানুদাসকে বললে—রোদ্দুরের তেজ বড় কড়া, চল বাইরের দাওয়ায়। সাবিত্রী ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। ভানুদাস খুশী হল। আরো খুশী হল গোপলাকে ভুলা আর জলে হাতে আসতে দেখে। ছেলেটা একটু জেদী, কিন্তু ভাল। সেই ভোর থেকে নিশ্চয়ই জল উথাল পাতাল করে মাছ মেরেছে।

কাছে আসতেই গোপলাকে ডাকল—দেখি রে—

কাত করে ডুলাটা ধরল ভানুদাসের সামনে। ভানুদাসের মন ভরে গেল। অনেক মাছ পেয়েছে। জিওল মাছই সব। শোল, কই, মাগুর, সিঙ্গী। নয়না পেয়েছে কয়েকটা।

পালাগুলো ঠিক মত দিয়েছিস ত?

গোপলা ঘাড় নাড়ল।

সাবিত্রী গোয়াল থেকে ঘরে গেল।

গোপলার মা এখন মাছ কুটতে বসবে। হয়ত ইতিমধ্যে ডাল হয়ে গেছে, কলা সেদ্ধও। এক্ষুনি ভাত বসাবে উনুনে। তারপরই মাছের ঝোল। একটু বেলা হবে। তা হোক। একবার ইচ্ছে হল সাবিত্রীকে ডেকে বলে ঝোলটা একটু ভাল করে রাঁধতে, একটু বেশী লঙ্কা দিয়ে, ভাল করে ভেজে। কিন্তু বলতে বাধল। কি ভাববে সাবিত্রী? কি বলবে? তার চাইতে ওর ইচ্ছে মত রাঁধুক। খারাপ লাগলে বকবে, ভীষণ বকবে।

মাছ ধুতে পুকুরে গেল সাবিত্রী নয়, কানুর বউ। ভানুদাস ভাবলে সাবিত্রী হয় ত অন্য কাজ করছে। আহা, কানুর বউটা মন্দাই হলে হবে কি, খুবই ভাল। সাহায্য-টাহায্য করে। এ না হলে বউ।

সাবিত্রী উঠোনে এল ঝাঁটা হাতে। উঠোন ঝাঁট দিল। গোপলা আর সাবিত্রী ধরাধরি করে ধান এনে ছড়াল উঠোনে। ভানুদাসকে লক্ষ্য করে সাবিত্রী বললে—একটু নজর রেখ। সাবিত্রী চলে গেল। মাছ ধুয়ে কানুর বউও ফিরল পুকুর থেকে। আর দেরী নেই। হয়ে গেল বলে। ভানুদাস মনে মনে ক্ষণ গুনছে, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে উঠোনের ধারের নিমগাছ, নিমগাছের পশ্চিমে হেলেপড়া ছায়া, পুকুরপাড়, পাড়ের কলাঝাড়, যজ্ঞি ডুমুরের গাছ, তেলাকুচোর লতা, আরো কত কি।

একটি কাঠবেড়ালী সুড়ুৎ করে ডুমুর গাছ থেকে নেমে নিমগাছে উঠে গেল। ভানুদাস দেখছে কাঠবেড়ালীটা দ্রুত উপরে উঠছে। উঠতে উঠতে এক সময়ে থমকে থেমে গেল। রোদ্দুর পড়েছে কাঠবেড়ালীটার মুখে। মুখটা থম থম করছে। একজোড়া চড়ুই বসল উঠোনে। ধানের উপর। একটি পায়রা। ভানুদাস হাত নাড়াতেই উড়ে গেল। আবার তাকাল নিমগাছের দিকে। না নেই। কাঠবেড়ালীটা এ ফাঁকে পালিয়ে গেছে। ভানুদাস মনে মনে হাসল। সে জানে, কাঠবেড়ালীর জাতটাই দুষ্টু। একটু নজর সরিয়েছ কি, ফুড়ুৎ।

কোথায় যে লুকুবে ঈশ্বর জানে। একটু স্থির হয়ে একদণ্ড বসবে না। সারাক্ষণ হুটোপুটি ছুটোছুটি। কিছু করার নেই ত অকারণ তিড়িংবিড়িং লাফ। অকারণ গাছে গাছে ছুটে বেড়ানো।

গোপলা ডাকছে।

কি রে ?

খাবে চল।

হয়ে গেছে। ভানুদাসের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। দ্রুত লাঠি হাতে উঠতে চেষ্টা করল। উঠল। গোপলা এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল।

ভানুদাসেব মনে হয়েছিল সে অনেক ভাত খাবে, এক থালা কি তারো বেশী। কিন্তু খেতে বসে কিছুই খেতে পারল না। কয়েক মুঠো ভাত খেয়েই তার আর খেতে ইচ্ছে করল না। মনে হল, জিভে স্বাদ বলে আর কোন বস্তু নেই। ভাবলে, প্রচুর জল খাবে। তাও বিস্বাদ মনে হল। এক সময়ে ঝোলমাখা ভাত পাতে ফেলে উঠে গেল। সাবিত্রী বললে—এ দু'মুঠোর জন্যে এতো!

ভানুদাস ভেবে দেখল, এত হৈ চৈ না করলেও চলত।

খাওয়া সারা হলে আবার তাকে এনে বসিয়ে দিলে বাইরের দাওয়ায়। কোবরেজ বলেছে, ভাত খাওয়ার পর ঘুমুনো চলবে না। ঘুমুলে জ্বর পাল্টাবে। আর জ্বর পাল্টান মানেই নির্ঘাৎ মৃত্যু।

সাবিত্রী বললে—মাথার দিব্যি, ঘুমিও না।

ভানুদাস ঘাড় নেড়ে জানালে, সে ঘুমুবে না।

সাবিত্রী ভানুদাসকে ধান চৌকি দেবার কাজ দিল। হাতের কাছে এগিয়ে দিলে লম্বা একটি বাঁশ। প্রয়োজনে সেটা নাড়বে। চোখের উপর ঝুলিয়ে দিলে একটি টিন, একটি কাঠিও দিল। দরকার হলে বাজাবে।

সাবিত্রী এবার স্নান সারবে, খাবে।

সাবিত্রী চলে গেল।

একঝাঁক চড়ুই এসে বসল ধানে, সে টিনে ঘা দিল। একঝাঁক পায়রা উড়ে এল, সে বাঁশ নাড়ল।

নিমের ছায়া স্থির হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পুকুরপাড়ের কলাঝাড় স্তব্ধ। পশ্চিম কোণের বড় অশ্বত্থ গাছেও শব্দ নেই। এপাড়ের কাঁঠালগাছে কোথাও

বসে একটি কাক ডাকছে। কোথায় যেন চিঁহি করে একটি চিল ডাকল। একটি কাঠঠোকরা খট্‌খট্‌ করে ঠোঁট ঠুকছে কোথায় কে জানে। ভানুদাস আরেকবার টিন বাজাল। উঠোনেব ধুলো উড়িয়ে পায়রাগুলো চালে গিয়ে বসল।

কানুব বউ ফেনের বালতি নিয়ে গোয়াল ঘরে গেল। ভানুদাসের মনে পড়ল বিনু বুড়ীর গাইয়ের কথা। অনেকক্ষণ গরুটা ডাকে নি। কে নিয়ে গেল গরুটাকে ?

কানুর বউ গোয়াল থেকে ফিরতেই শুধল ভানুদাস।

কানুর বউ চাঁপারানী তেরচা চোখে একবার ভানুদাসকে দেখে সারা শরীরে বিকৃত, বিলম্বিত একটি ঢেউ তুলে মুখ ভেংচে বললে, মরণ।

ভানুদাস পলকে বোবা হয়ে গেল।

নিমের ছায়া পুবে হেলেছে। ধান ছোঁয় ছোঁয়। ভানুদাসের ঘুম পাচ্ছে। পে ঘুমুবে।

ভানুদাস বেড়ায় হেলান দিল। ভীষণ ঘুম আসছে তার, ঘুম। সে চোখ বুজল, চোখ খুলল। অস্পষ্ট দেখল, একঝাঁক চড়ুই আর পায়রা পড়েছে ধানে। ভানুদাস হাত ওঠাতে চেষ্টা করল, পারল না। ইচ্ছে হল টিনে ঘা দিতে, বাঁশ নাড়তে। না, সে কিছুই করতে পারল না। পায়রা ধান খাচ্ছে, খাক। চড়ুই ধান খুঁটছে, খুঁটুক।

ভাল করে ঠেসান দিয়ে সে চোখ বুজল।

ঘুম, ঘুম, ঘুম।

কখন ধীরে ধীরে বেড়ার গা থেকে মেঝেয় এলিয়ে পড়েছে ভানুদাস নিজেই জানে না। কখন সে হাত জোড়াকে হাঁটুর ফাঁকে গুজে দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়েছে, তাও না। যখন হাড় কাঁপান চিৎকারে সাবিত্রী বাড়ি মাথায় করল তখন আচমকা জেগে উঠল ভানুদাস। প্রথমে সে চালের রুপাগুলো দেখল, বাখারীগুলো, তারপর দেখল সাবিত্রীকে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

ততক্ষণে সাবিত্রী গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখছে গা গরম হয়েছে কিনা। মুখে বকছে হাজার রকমের। দোষ দিচ্ছে পোড়া কপালের।

হতভম্বের মত ভানুদাস শুধু সাবিত্রীর দিকে চেয়ে রইল। ভীষণ ভুল হয়েছে ভানুদাসের। ঘুমনো কিছুতেই উচিত হয় নি। কিছুতেই না। কিন্তু

পোড়া চোখকে কে বোঝাবে ? ওরা যে মানছে না।

ভানুদাসের আবার ঘুম আসছে। ঘুম। তার মনে হচ্ছে না ঘুমুলে সে মরে যাবে। কিন্তু ঘুমুতে গেলে আস্ত রাখবে না। সাবিত্রী উঠোনে ধান কুড়োচ্ছে।

শরীরে একটা ঝাকুনি দিয়ে ভানুদাস ধীরে ধীরে লাঠিটা হাতে নিল। সন্তর্পণে দাওয়া থেকে নামল উঠোনে। না, সে আর বসে থাকবে না। হউক শরীর দুর্বল, তবুও না। বসে থাকলেই আবার শালার ঘুম আসবে। ঘুমুলে সাবিত্রী বকবে। বরং এই পড়ন্ত বেলায় ধীরে ধীরে কন্দুর ঘুরবে। নিদেন উত্তর মাঠের কোনা তক্।

ধীরে ধীরে উঠোন ডিঙোল। সে ভেবেছিল হয়ত এর জন্যে সাবিত্রী তাকে অকথ্য বকবে। মাথা কুটবে। সে উৎকর্ণ হয়ে রইল সাবিত্রীর ঝাঁঝাল কথার জন্যে। না, সাবিত্রী কিছুই বলল না। কিচ্ছু না।

পায়ে পায়ে আলের রাস্তা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিল ভানুদাস। এখানকার আকাশটা অনেক বড়। ঘরের আকাশের চাইতে, বাড়ির আকাশের চাইতে। ভানুদাস কিছুক্ষণ আকাশ দেখল। তারপরে আকাশের নীচের গাঁ। ওই দূরে, উত্তরে নিমতা সাহাতলী, তার পূবে কাঞ্চনা, আরো পূবে কদমতলী। হেতমপুর থেকে কদমতলী অনেক দূর। নির্ঘাৎ পাঁচ মাইল। ভানুদাসের চোখ এখন মাঠ জরিপ করছে। ফ্যাকাশে মাঠ চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। ধান কাটা কবে শেষ হয়ে গেছে। চোতফসলের জমিতে এখনো লাঙল পড়েনি, পড়বে।

ভানুদাস হাঁটতে লাগল।

সড়কের কিছু অংশ ফাঁকা, তারপরেই বিঘে কয়েকের সুপুরী বাগিচা। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ভানুদাস সুপুরী বাগানের ছায়ায় ছায়ায় এগোতে লাগল। কতরকমের পাখি ডাকছে এখানে ওখানে। পড়ন্ত রোদ্দুর ডাল থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। একটা শেয়ালকে ছুটে যেতে দেখল ভানুদাস। একটা হরিবোল পাখি ডাকল। একটা পিউপিউ।

সুপুরী বাগিচা ছাড়ালে বটতলী। সেখানে ক্ষণকয় জিরোল ভানুদাস।

বটতলী থেকেই রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা চলে গেছে সাহাতলীর দিকে, আরেকটা বাবুদের বাড়ির পাশ দিয়ে বেঁকে হেতমপুরের হাটে। ভানুদাস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর পা বাড়াল হাটের

দিকে। অতদূরে সে যাবে না। সে যাবে সাঁকোর ধারের দোকান পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার ফিরে আসবে সন্ধ্যের আগে। সে পা বাড়াল। না খুব দুর্বল মনে হচ্ছে না আর। একটু ঝরঝরে ভাব এসেছে শরীরে। সে হাঁটতে লাগল। কিছু দূরে যেতেই নজর পড়ল সাঁকোর ধারে যাবার মাঠ কোনাকুনি পথটা। সড়ক পথের চাইতে এ অনেক সোজা।

সে মাঠে নামল।

কয়েক পা এগিয়ে আল ডিঙোতে গিয়ে একটা হোঁচট খেল। পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। ভীষণ লেগেছে পায়ে। সে আলের উপরই বসে পড়ল।

বেলা ক্রমে ভাঙছে। রোদের তেজ মর মর।

বাঁ দিকের বাবুদের বাড়ীতে একটা কুকুর ডেকে উঠল। ভানুদাসের নজর গেল সেদিকে। এ কী!

একটা কাঠবেড়ালী একটি কচি শশা মুখে সুড়ুৎ করে লাফ দিয়ে পড়ল তেঁতুল গাছের ডালে। ভানুদাস নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। একটু পরে আরেকটি। আরো একটি। আহা রে! একেবারে সব্বোনাশ করে দিচ্ছে। ভানুদাস মনে মনে বললে, বাড়িতে কি লোকজন নেই একটু ঢেকে ঢুকে দেবে?

ভানুদাস পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। মাঠ ছাড়িয়ে সড়ক। সড়কের ধারের আমকাঁঠালের ছায়া ছাড়াতেই বাবুদের গোয়াল ঘর। গোয়াল ঘর ছাড়িয়ে পা বাড়াতেই ভানুদাসের কোটরে ঢোকা ম্লান চোখ জোড়া হঠাৎ অপরিমিত সুখে, খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মানুষ সমান নয়, তার চাইতেও উঁচু মাচা অনেকটুকু জায়গা জুড়ে ছড়ান। মাচানের নীচে ছায়া ছায়া ভাঙা বেলার অন্ধকার। ফাঁকে ফোকরে বিকেলের নরম রোদ ঢুকে পড়েছে সতর্ক চোরের মতো। হামাগুড়ি দিচ্ছে এখানে ওখানে। কোথাও বা হাওয়ায় কাঁপা পাতার উপরে বেল্লাড়া খুশিতে নেচে বেড়াচ্ছে। ভানুদাসের মনে হল, মা বসুমতী তার আগলে রাখা ঝাঁপির সব টুকুই বুঝি উপুড় করে দিয়েছে শতহস্তে। গুনে শেষ করা যায় না এমনি সংখ্যাহীন শশা আর শশা। ভানুদাস পরিমাণহীন খুশীতে শ্বাস নিল, ছাড়ল। সে জানে না কখন পায়ে পায়ে পথ ছেড়ে মাচানের নীচে এসে পড়েছে। সে দেখছে ফুলের, পাতার, নানারঙের শশার সে কি এলাহি ব্যাপার। পাতা কাঁপছে, ডগা কাঁপছে, সে এগিয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে।

ভানুদাস সব ভুলে গেছে। তার অসুখ, তার দুর্বলতা। একবারও মনে

পড়ল না, সে অশক্ত, সে অক্ষম। সে সহজে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল এক হাজার, এক কোটি চক্ষু। তার ইচ্ছে হল প্রতিটি শশাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে, প্রতিটি হলদে ফুলকে আলতোভাবে নেড়ে দিতে। আর, আর, তার ইচ্ছে হল ঝুলে পড়া সবুজ সাপের ফণার মতো ডগাগুলোকে নরম হাতে তুলে দিতে মাচানের উপরে।

এক ঝাপটা বাতাস এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাচানের গায়ে। ফুল, ফল, লতাপাতা সব একসঙ্গে দুলে উঠল। রোদের বস্তুগুলো এলোমেলো হয়ে গেল ক্ষণেকের মত। কোথাও বা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল পাতার রোদ ফুলে, ফুলের রোদ ফলে, ফলের রোদ মাটিতে। ভানুদাস পাগলের মতো ঘুরে গেল পলকে। কী খুশী! কী খুশী! তার শিরায়, উপশিরায় সীমাসীমাহীন এক দূর ব্যাপ্ত সুখের স্রোত বয়ে গেল। সে মাত্রাতিরিক্ত খুশীতে শিহরিত হল। পুলকিত হল। সে মনে মনে প্রার্থনা করল—আরো হোক, আরো বাড়বাড়ন্ত হোক। এ না হলে ফলন। মনে মনে বললে—মা বসুমতী এমনি করে ঘরে ঘরে দিক, প্রতি ঘরে।

সে আলতো হাতে কয়েকটি কাঁচা-পাকা শশা ছুঁয়ে দেখল। নেড়ে দিল কয়েকটি ফুল। দু'চারটে ডগা উঠিয়ে দিল মাচানের 'পরে। এবং আর এক ঝলক বাতাস আসতেই সে সামনের দিকে তাকাল। সে কী! ভানুদাস অনড় অচল। সে হঠাৎ অনুভব করল তার পায়ের নীচের মাটি ক্রমে সরে যাচ্ছে। সে স্থির হয়ে কি যেন কি বলতে যাবে, তার আগেই বাবুদের ছোট বউ পড়িমরি বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। ভানুদাস পা বাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে। তার মনে পড়ল, তার নজর খারাপ, সে কাটাবক্র। একথা মনে হতেই তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। তার ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে' একগাদা কথা তার বুকে ঠেলে গলার কাছে এসে থেমে গেল।

বিশ্বাস কর, ছোট বউ, ও নয়, ও নয়। মা গো মা, ও নয়, আমি কাটাবক্র নই, আমি ভানুদাস, ভানুদাস। ছোট বউ। অনেক বীজ পুঁতেছি, কিছু ফলে নি, তাই ছোট বউ, পরের ঘরের ফলন দেখলে খুশি হই, বলি, আরো হোক, আরো বাড়বাড়ন্ত হোক। ছোট বউ। নজর আমি দিই নি। আমি খুশী হয়েছি। ভীষণ খুশী।

ভানুদাসের বলা আর হল না। তার উপর কত লোক, কত লোক। চারিদিকে

হাটের শব্দ। ভানুদাস এক গাদা মানুষ আর এ ঝাঁক গলার শব্দ শুনল। কি যেন বকছে, কি যেন বলছে।

কয়েকজন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে মাচানের তলা থেকে উঠোনে নিয়ে এল। ভানুদাস কিছুই বুঝতে পারছে না। সে শুধু বুকের ভিতর, গলার কাছে পাক খাওয়া কথাগুলো বলতে চাইছে, বার বার বলতে চেষ্টা করছে। কি আশ্চর্য! কেউ শুনছে না।

ভানুদাসকে ছুঁড়ে ফেলেছে উঠোনে। কিল, চড়, লাথি সামনে চলেছে। ভানুদাস কিছুই দেখছে না, শুনছে না কিছুই। সে যেন পাকে পাকে কোন গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে, ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে শেষবারের মত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বলল—খারাপ নজর আমি দিইনি, ঈশ্বর জানে। তারপরে সে ঢলে পড়ল উঠোনে। ছোট ছেলেরা তখনো পা দিয়ে ঠোকরাচ্ছে তাকে, বড়রা বকছে॥

দেশ/২০ ফাল্গুন ১৩৬৭

পানু দত্তের বানপ্রস্থ

হর্তুকীতলায় একটা হর্তুকীও পড়ে নেই। কে যেন আগেভাগে সব কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। তা কুড়িয়ে নেবারই কথা। সরকারী রাস্তার উপরের এমন বেওয়ারিশ গাছের ফলের মালিক সবাই। কিছু বলবে কে? কিন্তু পানু দত্তের মনে হল এমনটি না হলেই ভাল ছিল। তাতে ফলের লোভে যে কেউ হাত বাড়াতে সাহস পেত না, খবরদারির সূচ ফাল হয়ে বিঁধত গায়ে। রক্তারক্তি হয়ে যেত। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আবার মনে হল, হয়ত গাছটা আদপেই বেওয়ারিশ নয়। হবেও বা কেন? এই বিশ্ব-সংসারে কুটোকাটারও ওয়ারিশদার আছে, আর এতো জলজ্যান্ত একটি গাছ, তায় ফলন্ত। তাছাড়া গাছটি নেহাত ছোট নয়, চিরলে তক্তা হতে পারে, এমনিতে উঁচুদরের জ্বালানি। তা ছাড়া সরকারের হর্তুকী গাছ পোঁতার দায় কিসের? সরকার পুঁতলে বড়জোর বট অশ্বত্থ পুঁতবে, হর্তুকী পুঁতবে কোন দুঃখে। অবশ্য ভুল করেও পুঁততে পারে। কিন্তু এ গাছ ভুল করে পোঁতা হতেই পারে না। প্রথমতঃ গাছটা সরকারী রাস্তার ওপরে নয়, ধারে। পাশের জমি নন্দীদের, রাস্তার ধারের দোকানগুলোও। অবশ্য নন্দীদের জমি আর হর্তুকী গাছের মাঝ দিয়ে হাতখানের একটা রাস্তা খালধার ধরে ধরে সোনারপুরের দিকে চলে গেছে। লোকে যদিও বলে, এটাও সরকারী রাস্তা, কিন্তু পানু দত্তের মন সায় দেয় না। শুধু শুধু সরকারের খালধারে হাতখানেক জমি ছেড়ে দেবার দায়? আসলে জমিটা নন্দীদেরই পুকুরের অংশ: পাড়ের গড়ানে জমি। নন্দীদের গা নেই তাই। নইলে তৌজি নম্বর ধরে খাসমাহাল থেকে খতিয়ানটা দেখলেই বোঝা যেত রাস্তার জমিটা কাদের। আর রাস্তার হিসেব পেলে গাছের হিসেব ত হাতের মুঠোয়। কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা। ওই ত বুদ্ধি দেবার লোক কামারপাড়ার নেত্য। তা প্রাইমারী ফেল নেত্যর পেটে বিদ্যেও কি, বুদ্ধিও কি। যদি পড়ত আমার হাতে, শুধু হর্তুকী গাছ নয়, রাস্তার জমিটাও চলে আসত নন্দীদের কাঁটাতারের আওতায়। কিন্তু নন্দীবাবুরা ওকে একেবারেই পছন্দ করেন না। কেন করেন না কে জানে। অবশ্যি এখন আর করেও লাভ নেই। কেন? সে অনেক কথা। পানু দত্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হর্তুকী

গাছের দিকে তাকাল।

সেই কখন থেকে একটি হর্তুকী পড়ার অপেক্ষায় বসে আছে। মরা ডাল পড়ছে, হলদে পাতা ঝরছে, এমন কি হঠাৎ করে একটা ডাং-গুলির গুলিও পড়ল, কিন্তু হর্তুকী পড়ার নামগন্ধও নেই। পানুদত্তের প্রায় ঘেন্না ধরে এল। নিজের উপর ঘেন্না, সংসারের উপর, এমন কি গাছের হর্তুকীর উপরও। বাসিমুখে এখনো কিছুই পড়ল না, অথচ খাওয়া সেরেছে সেই কখন। পুরো তিন পো মাইলের মাঠ ডিঙিয়ে এসেছে, তারপরও পহর যায় যায়। পানু দত্ত উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, নেহাত বয়স বেড়ে গেছে তাই, নইলে—। একবার ভাবল খালধারে সার সার বাঁশের চালি বেঁধে রাখা পোঁতা বাঁশ একটা তুলে এনে দুচারটে ঝুলে থাকা ডালে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দেয়। কিন্তু তা করতে গেলে কাদা মাড়াতে হয়, তা ছাড়া ভাঁটার টানে যদি চালিগুলো ভেসে যায় আড়তদার বেইজ্জত করে ছাড়বে। বরং তার চেয়ে ঢিল ছোঁড়া যাক। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তার ধার থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে একটা ছুঁড়ল। ঢিলটা হর্তুকী গাছের গা-ঘেঁষে বটোকেষ্টর টিনের চালায় পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। আরেকটা মারল, সেটাও। আরো একটা মারল, এটাও। হায়রে! মনে মনে ভাবল পানু দত্ত, সেই হাতের টিপ যে কোথায় গেল! অথচ ছেলেবেলায় কত কত ডাঁসা আম, পেয়ারা পেড়ে খেয়েছে। প্রায় ক্ষেপে গিয়ে আরেকটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে যেতেই দেখল, ঝাঁপ তুলতে তুলতে গালাগাল দিচ্ছে বটোকেষ্ট—শুয়োরের বাচ্চাদের জ্বালায় দিনে-দুপুরেও কি টিকবার জো আছে! ফিরে দাঁড়াতেই পানু দত্তের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে বলল—আপনি!

পানু দত্তের হাত থেকে ঢিলটা মাটিতে পড়ে গেল। নজর এড়াল না বটোকেষ্টর। চোখের পলক পড়বার আগেই সে আবার ঝাঁপের আড়ালে চলে গেল। পানু দত্ত অন্য সময়ে হলে বটোর কাণ্ড দেখে হাসত, আজ হাসল না। আসলে বটোর ভয় নিরর্থক। পানু দত্ত এখন ঢোঁড়ারও অধম। বিষ ত নেই, চক্করও না। পানু দত্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যদি একটা হর্তুকী পড়ে।

তা হর্তুকী একটা পড়ল। পানু দত্ত ছুটে গেল, কিন্তু তার আগেই নাপতে পাড়ার বিনুর মা বুড়ি যাচ্ছিল, কুড়িয়ে নিল। পানু দত্ত ঘুরে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বেনে পাড়ার ধীরুর রাখালটা কানাডোমের ছেলে নগাকে সঙ্গে করে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। পানু দত্ত ওদের দিকে কটমট করে তাকাল।

নিশ্চয়ই, ছোঁড়াগুলো হর্তুকীর মতলবে এসেছে। ক্ষণ কয় মনে মনে গজরে বলল, এই, গাছে উঠতে পারিস ?

রাখাল ছোঁড়াটা ঘাড় নাড়ল।

— ওঠ।

—পয়সা দেবেন ?

—পয়সা ?—পানু দত্তের চোখ বড় হল।—পয়সা কিসের রে ?

—যা গাছে উঠব অমনি অমনি।

ওরে আমার ঝিয়ারীর পুত, আব্দার কত!—মনে মনে বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল পানু দত্ত। শালার ছেলেগুলোও হয়েছে বিচ্ছু। কথায় কথায় পয়সা! পয়সা কি গাছে ফলে ? পানু দত্ত থুক করে থুথু ফেলল।

আরেকটা হর্তুকী পড়ল।

কানাডোমের ছেলে নগা ছুটে হর্তুকীটি কুড়িয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি মুখে পুরল। ধুলো মোছারও সময় নিল না।

আরো একটা পড়ল। রাখাল ছোঁড়াটা ছুটে গিয়েছিল, পানু দত্তও। রাখালটা হাত বাড়াবার আগেই ধাক্কা দিয়ে দত্ত কুড়িয়ে নিল। ছোড়াটা রুখে উঠতে যাচ্ছিল, দিলে আরেক ধাক্কা। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নগা রুখে উঠল। বলল—ওকে আরেকটা ধাক্কা দিয়ে দেখ না, বেতের ঘায়ে,—

পানু দত্ত নগাকে ধরবার জন্য যাচ্ছিল, নগা পেছুতে পেছুতে বলতে—শালার বুড়ো।

—কি বললি ?

শালা—বলেই ছুটে নাগালের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বক দেখতে লাগল। রাখালটাও!

পানু দত্ত আর এগোল না। ভাবল, ডেঁপো ছোঁড়াদের কাণ্ড, আরো ঘাঁটালে নিশ্চয়ই সম্মান যাবে। সুতরাং এতক্ষণ যে ডাঁসা হর্তুকীটাকে গালের এপাশ ওপাশ করছিল সেটাকে জিভ দিয়ে মাড়ির দিকে ঠেলে দাঁত বসিয়ে দিল। হর্তুকীর রসে গাল ভরে গেল। ঢোক গিলতেই মুখ বিকৃত হল একটু, একটা কষ-তেতো স্বাদ পেলো। একটু পরেই একটা মিষ্টি আমেজ। পানু দত্ত আরেকবার ঢোক গিলল। তারপর শাঁসটুকু চুষতে লাগল ধীরে ধীরে। আঃ। পানু দত্ত পায়ে পায়ে বটোকেষ্টর দোকানের বারান্দায় পাতা সুপুরী-গাছের বাখারীর তৈরী টুলের উপর এসে বসে পড়ল। একবার তাকাল ডাইনে।

রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে গোপালপুরকে দুভাগে চিরে রামরতনের হাটের উপর দিয়ে ঢালার মুখ ছুঁয়ে শিয়ালবুক্কার দিকে। পানু দত্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল। দূরে যেখানটায় রাস্তার ছোট বাঁকটা সুপুরীবাগানের আড়ালে চলে গেছে সেখানে ধুলো উড়ছে। হয়ত তরকারী বোঝাই গরুর গাড়ী আসছে, অথবা গুড়ের কলসী বোঝাই হয়ে, নতুবা মোজাম্মেল ড্রাইভারের ধ্যাড়ধ্যাড়ে ফোর্ড গাড়িটা। কিন্তু কই বিকট শব্দ ত হচ্ছে না। নিশ্চয়ই গরুর গাড়ি। নিশ্চয়ই—

না, গরুর গাড়ি নয়, মোজেম্মেল ড্রাইভার-এর মান্ধাতাই ফোর্ডটাও নয়, বৃন্দাবন মাস্টারের স্কুল ছুটি হল। ছেলের পাল আসছে রাস্তার ধুলো ওড়াতে ওড়াতে। পানু দত্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল, হত যদি মাস্টার তবে বেত পিটে পিঠের ছাল তুলে ছাড়ত। তা মাস্টারগুলোও তেমনি। ছুটি দিবি তা রোদ্দুরটা পড়ে গেলে দে, তা না তাতান রোদে যখন রাস্তার বালি ফুটছে তখন কিনা ছেলেগুলোকে ছাড়লি। এখন কি এসব ধম্মের বাছুর বাড়ি ফিরবে? ঠিক কারো আমবাগানে গিয়ে ঢিল ছুঁড়বে, নয়ত কারো জামগাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে; হাত ভাঙবে, আতুর হবে।

—এই ছক্কা পাঞ্জা…

—দুরি তিরি

পানু দত্তের কান আলগা হল মুহূর্তেই। নিশ্চয়ই নন্দীদের ঘাটে পাশার ছক পেতেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে ভাবল, নিশ্চয়ই তিনু কোবরেজের ছক। তা ছাড়া ছক আছে কার? তা ছাড়া সময়? পানু দত্ত গুটি গুটি ঘাটে এসে বসল; জুড়ি বেঁধেছে তিনু মণি, শ্যাম আর গনু, নুটু, ধীরা। দু-চারজন রসিকও এসে জুটেছে ধুপীপাড়া আর বারুইপাড়া থেকে। দত্তও ভিড়ে গেল। গনু একবার খেলতে খেলতে মুখ তুলে বলল, কাছারীতে গেলেন না দত্ত মশাই?

—আর কাছারী!—পানু দত্ত পুনরাবৃত্তি করল ভাঙা গলায়।

—তা বটে। গনু আবার দান দিতে মেতে গেল।

বারুইপাড়ার বামার ছেলেটা দত্তর পাশেই বসেছিল। এ কথা সে কথার পর দত্ত জিজ্ঞেস করল—ওরে তোর সেই জমির কবলা হয়ে গেছে?

হারু ঘাড় নাড়ল।

—কি হল?

—নন্দীবাবুরা আগে কাগজ দিতে রাজী হল না।

—তা বলে কয়ে টাকাটা ধরে দিলি নে কেন?

—নিশি বিশ্বাসের ছেলে দিলে ত?

—দিল না?

—না।

—তা তুই—পানু দত্ত নড়ে চড়ে হারার গা ঘেঁষে বসে দুকথা বলতে যাবে, হারা উঠে পড়ল। তিনু কোবরেজ বললে—আরে বোস বোস, যাচ্ছিস কোথায়? হারা ইশারা করল চোখে। পানুদত্তর চোখ এড়াল না। ফস করে দত্ত বলল—আমি তোর কি করলাম রে হারা?

—আমি বলেছি? হারু মুখ কাঁচুমাচু করল।

—বেটা বারুইর পো, বলার কি বাদ রাখলি?—দত্ত কটমট করে তাকাল। তিনু কবরেজ বেশ রেগে গেল। বলল—তা অত সাতকাহন করে জমির কথা তুললেন কেন?

—দোষ হয়েছে?

খেলা দেখতে এসেছেন দেখুন, তা না এখানেও সেই ঘোড়ার চাল!

—তাতে তোমার কি?—পানু দত্ত ক্ষেপে উঠে দাঁড়াল।

—আমি ছক পেতেছি তাই।

গুনু, নুটু, মণি, বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল—ছেড়ে দিন তিনুদা, লোকের স্বভাব না মলে যায় না। তা দিন দেখি, দান দিন। তিনু কোবরেজ আবার পাশা ছাড়ল।—এই ছক্কা…

পানু দত্ত প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঘাট ছেড়ে। সামনে রাস্তা। এগোতে যাবে, একরাশ ধুলোর ঝড়ের মতো ছেলের পাল সামনে এসে পড়ল। পানু দত্তর ইচ্ছে হল ছেলেগুলোর কান মলে দেয়, এমন কি পাশা খেলুড়ে বয়সীগুলোরও। মনের ইচ্ছে মনেই রইল। গজ গজ করতে করতে আবার এসে বসল বটোর সুপুরীর বাখারির চৌকিতে।

ছেলেদের পায়ে পায়ে ওড়া ধুলোর রেণুগুলো তখনো উড়ছে; ছেলেদের কয়েকটা তখনও ঘুরঘুর করছে হর্তুকীতলায়। পানু দত্ত গালের পাশে এতক্ষণ জিইয়ে রাখা হর্তুকীর বীচিটাকে জিভ দিয়ে টেনে এনে চুষতে চুষতে ভাবতে লাগল—সব শালা নেমকহারাম। নইলে এই তিনুর জন্যে কি না করেছি গেল বছরে। যতের পো নিধিরাম ত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, তখন ত পা

চাটতে বাকি রাখে নি। এখন শালার বাড় বেড়েছে। আচ্ছা, আমিও ভুগু দত্তর পো পানু। নাইবা রইল বিষ, ছোবলান ঠেকাবে কে? পানু দত্ত হর্তুকীটাকে জোরে জোরে কামড়াতে লাগল।

সামনের ছেলেগুলো তেমনি ধুলো উড়িয়ে ঘুরঘুর করছে হর্তুকীতলায়। পানু দত্ত চোখ সরিয়ে নিল। রাস্তার ওপাশের সাঁকোর বাঁশে বসে একটা টিটিঙে পাখী লেজ দোলাচ্ছে। তার ওপাশের কেয়া ঝাড়ে এক দল চড়ুই ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। তারপরেই ছড়ানো মাঠ গুনগুনিপুকুরের ধার পর্যন্ত। এখান থেকে পুকুরপাড়ের মাদার গাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফুল ফুটেছে প্রচুর। পুকুরের পুবের বদ্যিদের বাড়ির টিনের চাল, পশ্চিমের মাঠ, মাঠের ওপারের হকসাহেবদের গাঁটাও দেখা যাচ্ছে। যদিও স্পষ্ট নয়। পানু দত্ত ধীরে ধীরে দৃষ্টি গুটিয়ে নিল। রোদ্দুরে মাঠ জ্বলছে। দূরের মাঠের অনেকটুকুকে মনে হচ্ছে জলা। পানু দত্তর মনে হল তার মনের ভাব কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আগের রাগ আর অবশিষ্ট নেই। তার মনে হল, কতদিন এমনি দুপুর কোথা দিয়ে কেটে গেছে তার খেয়াল ছিল না। তখন কোথায় বাঁশের মাথায় পাখী বসে লেজ দোলাচ্ছে দেখবার দায় ছিল না, চড়ুই দেখার ফুরসুত, মাদারের ফুল দেখবার মন! তখন মন ডুবে থাকত নথি-পত্রে, কবলা-কবুলিয়তে। আর আজ? পানু দত্ত হর্তুকীর বীচিটাকে জোরে জোরে চুষতে লাগল। হয়ত এমনিই হয়। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবল—এতগুলো লোকের সামনে তিনু কোবরেজ মুখের উপর বড্ড বড় কথা বলে দিলে। শালার গনুটাও কিনা ফোড়ন দিলে। কাল নিশ্চয়ই একথা সর্বত্র রাষ্ট্র করে দেবে হারু। তখন আরেকবার লোকে ছি ছি দেবে। কিন্তু কি করতে পারবে পানু দত্ত?

একটা বাস আসার শব্দ এল কানে। বাঁ দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই শহরের বাস আসছে। এখন গয়লারা ফিরবে দুধের খালি ঘড়া আর বাঁক নিয়ে। হয়ত গাঁয়ের কেউ কেউ আসবে শহর থেকে। পানু দত্ত ওদিকে তাকিয়ে রইল। ধুলো উড়ছে চালতাপুকুরের বাঁকে। জোর শব্দ আসছে। একটু পরেই বাস এসে দাঁড়াবে নন্দীদের ঘাটে। দত্ত অপলক তাকিয়ে রইল।

ধুলো ক্রমে বাড়ছে, শব্দও। গাড়ি এল, বাস নয়, একটা জীপগাড়ি একটি মেয়েকে নিয়ে পলকে হাওয়া হয়ে গেল। ভাল করে দেখাও হল না পানু দত্তর। শুধু লাল শাড়ির উড়ন্ত আঁচল, একখানা লাল টকটকে মুখ, একগাল হাসি আর একরাশ ধুলো ছাড়া কিছুই দেখল না। তবু পানু দত্ত তাকিয়ে রইল।

দেখল ঝাঁক ঝাঁক ধুলোর আড়ালে হারিয়ে গেছে সেই গাড়ি, মেয়েছেলেটা, তার শাড়ি, মুখ, হাসি। একটু পরে শব্দও। শুধু ধুলো উড়ছে এলোপাথাড়ি। পানু দত্ত ভাবল, হয়ত বড়লোকের বউ, বড় ঘরের মেয়ে। নইলে এত রূপ কি একটি শরীরে ধরে? না, পানু দত্ত এত রূপ এক অঙ্গে কখনো দেখে নি। যৌবনে দেখা সাতগাঁয়ের সেরা রূপসী চপলার শরীরেও নয়। চপলার ত এমন হাসি ছিল না, ঘরপোড়া আগুনের মতো এত দাউদাউ রূপ! এমন সাজতে চপলা পারত না, কিছুতেই না।

পানু দত্ত আপন মনে মাথা নাড়ল, সে কারোকে দেখে নি। অবশ্য দেখার সময়ও ছিল না। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করে এনেছিল হরির মাকে। তারপর হরি হল, সরি হল, ব্রজ হল। ব্রজর পরেও তিনটে। কিন্তু সব মরে গেল, রইল শুধু হরি। একদিন হরির মাও গেল। ততদিনে কাছারী খাসমাহালেই মজে গেল। আর চোখ তুলে দেখার সময় হল না পানু দত্তর। মেতে রইল জমিজমায়, কবলা-খতিয়ানে, মামলা-মোকদ্দমায়। চোখের উপরে কত কি ঘটে গেল। রায়বাড়ির অত বড় ভিটেয় ঘুঘু ডাকল, গুহরা তেত্রিশ টুকরো হল, মন্ডলদের ভিটেয় মুসলমান বসল, উপীন যে উপীন সেও আঙুল ফুলে উপেনবাবু হয়ে গেল, কিশোরীবাবুরা এসে দাঁড়াল রাস্তায়, আরো কত কি! প্রায় সব ঘটনাতেই পানু দত্তর ইশারা ইঙ্গিত ছিল, কিছু কারসাজি। তখন পানু দত্তর নাম কত, হই-চই। ইতিমধ্যে হরি বড় হল, ছেলে হল। পানু দত্তর খেয়ালই ছিল না, কখন প্রায় শূন্য সংসার আবার চেঁচামেচিতে ভরে উঠেছে, জমি-জমাব ফসলে জমজমাট। এ জমি কি করে, কি ভাবে এল পানু দত্তর হিসেব রাখার সময় ছিল না। এ সবই দেখত হরি। সেই ব্যস্ত লোক পানু দত্তর হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। সব কিছু থেকে ছুটি। সে কি জানত বুড়ো বয়সে হঠাৎ এমন ছুটিও তার ভাগ্যে ছিল। অথচ অভ্যেস, অভ্যেস। কিছুতেই যাচ্ছে না। সেদিন ছেলেকে কি বলতে যাচ্ছিল, ছেলে মুখের উপর বলে দিল, ওসবে সে নেই। থাকবে কেন? আজ আর থাকবার দরকার নেই হরির, হরির বউয়ের, তার ছেলে পিলের। কি ভুলই যে করেছে পানু দত্ত। বেনামীতে জমি কিনেছে সব ছেলের বউ আর বড় নাতির নামে। যদি জানত এমন হবে, পানু দত্ত কি এত কাঁচা কাজ করত। কিছুতেই না। কিন্তু এখন আর শোধরাবার পথ নেই। দলিল-দস্তাবেজ সব হরির হাতে। কখন হাতিয়ে নিয়েছে পানু দত্ত জানে না। সেদিন সুয়াবিলের আঠারো গন্ডার কাগজটা চাইতেই বলল—কি হবে? ওতে

ত কোন গোলমাল নেই।

শুয়োরের বাচ্চা, গোলমাল থাকার মত জমি আমি কিনি নি সে আমি জানি। মনে মনে বলল। মুখে বলল—না তার জন্য নয়, তালুকটা কাদের দেখতে চেয়েছিলুম।

—ঘোষেদের। হরি জানাল।

পানু দত্তর মুখ চুন হয়ে গেল মুহূর্তেই। হরি মুখস্থ করে রেখেছে সব। সবই। করবে নাও বা কেন। পানুর রক্ত বইছে না হরির শরীরে। তাহলে? তারপর আর কোন কথা বলে নি পানু দত্ত। গত দুদিন ধরে সে মুখ বুজে আছে। অথচ তিন দিন আগেও পানু দত্তর দাপটে ধান পলকে খই হয়েছে; আর গত তিনদিন পানু দত্তর তাপে ধানও ফাটছে না, ফোটা ত দূরের কথা। পানু দত্ত হর্তুকীটাকে জিভের উপর এনে ধীরে মাড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে দ্রুত চাপ দিতে লাগল।

রোদ্দুর এতক্ষণ দূবে দূরে হামা দিয়ে ফিরছিল। কখন হামাগুড়ি দিয়ে এসে পানু দত্তর পা জড়িয়ে ধরেছে খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই পা জোড়া তুলে নিল উপরে। হাঁটু থুতোনি ছুঁল। একটু নড়ে-চড়ে একেবারে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল পানু দত্ত।

বেলা ভাঙছে, বাড়ছে। পানু দত্ত ভুলতে চেষ্টা করল ঘাট, কাছারী, খাসমাহাল, রেজেস্টারী অফিস, তার অতীত। কি হবে ভেবে? ওই ত রাস্তার মাঝের থমকানো রোদ্দুর ক্রমে বাড়তে বাড়তে বটোকেষ্টর দোকান ছুঁয়েছে। ক্রমে আরো বাড়বে। হর্তুকী গাছের তলা দিয়ে এক সময় বটোকেষ্টর দোকানটাকে রাঙিয়ে দেবে। তখন পুরনো টিনের চালা, মেঠো তেল দিয়ে রাঙান বাঁশের খেজুরীচালে বোনা ম্যাড়মেড়ে বেড়া, সব ক্ষণ-কয়েকের জন্যে রঙীন হয়ে যাবে। তারপর ক্রমে মিইয়ে যাবে সে রঙ, মলিন হবে, ধূসর হবে। এক সময়ে সব রঙ খুইয়ে নাপতে পাড়ার বিনুর মা বুড়ির চামড়ার মতো ঝুলে পড়বে ওই বটোর দোকান। পানু দত্তর ভাবতে ভাবতে মনে হল, তখন দোকানটিকে বুড়ির মতো মনে হবে, বুড়োর মত মনে হবে। তারপর আরো অন্ধকার হলে, আরো আরো, বাঁশতলীর শ্মশানঘাটের পড়ো পড়ো ছাউনির মতো হয়ে যাবে। তারপর এক-দিনের হঠাৎ ঝড়ে—ভেঙে চুরমার হয়ে লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়। তখন কিছুতেই সেই ছ্যাদরানো দরমা, খুঁটি, টিনের জঞ্জালগুলোকে বটোকেষ্টর দোকান বলে

চেনা যাবে না। কিছুতেই না। পানু দত্ত কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল, সে ডুবে যাচ্ছে ভাবনায়। তার মনে হচ্ছে, তাকে ভাবনার নিশিতে পেয়েছে। সে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর থেকে আরো গভীর এক নিতল অন্ধকারে। যেখানে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। রোদ না, মাছ না, ফুল, পাখি কিচ্ছু না। শুধু আঁধার আর আঁধার। এবং সেই অন্ধকারের তল ছোঁবার আগেই টের পেল সে-ও অন্ধকারে বটোকেষ্টর দোকান হয়ে গেছে, শ্মশান ঘাটের পড়ো পড়ো চালা, ঝড়ে পড়া ছ্যাদরানো দরমার বেড়া। ভয়ে, বিস্ময়ে পানু দত্ত নড়ে চড়ে বসার চেষ্টা করল, পারল না। মনে হল তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সে প্রায় মরিয়া হয়ে বাঁ পা-টা তোলার চেষ্টা করল, পারল না। কে যেন বিরাট ভার চাপিয়ে দিয়েছে পায়ের উপর। আবার চেষ্টা করল, ব্যর্থ হল। দত্তর মনে হল, পাটা যেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ, সাড়হীন, শক্তিহীন, কি ভার! পা ঝিনঝিন করে উঠল। ডান হাত দিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে, একযোগে কোনমতে খাড়া করল। ডান পা মাটিতে ফেলে বাঁ পায়ের উপর চাপ দিতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ল। তার মনে হল, ও-পা যেন আর মাটিতে বসবে না; বসাতে পারবে না। পানু দত্ত ভীষণ ভয় পেল। একে বয়স হয়েছে, যদি অচল হয়ে যায়, যদি অবশ হয়ে যায়। যদি অবশ হয়ে বিছানা নিতে হয়, তা হলে, তা হলে? পানু দত্তর ইচ্ছে হল, চিৎকার করে কাউকে ডাকে, চেঁচিয়ে বলে—আমাকে তুলে ধরো, আমি—মরিয়া হয়ে বাঁ পা-টা মাটিতে পেতে জোরে চাপ দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আবার কাত হয়ে বসে পড়ল। এ কী?

ঝিঁঝি ধরেছে পানু দত্তের পায়ে। খেয়াল হতেই শিরাগুলো টেনে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, এখনো অচল হয় নি। পানু দত্তের মনে হল, এখনো সে বিশ্ব-সংসারকে ভেল্কি দেখাতে পারে। সে উঠে দাঁড়াল।

একটা বিশ্রী শব্দ করে ঝাঁপ তুলল বটোকেষ্ট। একটা বাঁশ ঠেকিয়ে দিল ঝাঁপের তলায়। পানু দত্ত ঘুরে দাঁড়াল।

—কি, দুপুর-ঘুম সারা হল?

বটো হাসল। বলল—উঠলেন কেন, বসুন।

পানু দত্ত খুশি হলো বটের আহ্বানে। সুখ বোধ করল। না, সে একেবারে অপাংক্তেয় নয়। একেবারে ফুরিয়ে যায় নি।

পানু দত্ত এবার পা নামিয়ে বসল। রোদ্দুর সর্বাঙ্গে হাত বুলচ্ছে, বুলাক।

পানু দত্ত সরে বসবে না। তার এই তাপ, এই তেজ দরকার। রোদ্দুর থেকে যতটুকু পাওয়া যাবে কুড়িয়ে নেবে, এবং শেষবারের মত হরিকে, হরির বউকে, চতুর্দিকের নেমকহারাম এই বিশ্ব-সংসারকে বুঝিয়ে দেবে সে, সেই ঘোড়েল পানু দত্ত এখন মরে নি। এখনো তার মাথায় শত-সহস্র ফন্দি খেলে, অজস্র সুতোর জটিল জট খোলে, খুলতে পারে।

রোদ্দুর ক্রমে দত্তর গা বেয়ে বেয়ে চালার দিকে উঠে যাচ্ছে। তবু বাতাসে রোদ্দুরের আঁচ। সে একবার নড়ে চড়ে বসল। একঝলক বাতাস এল। বটোর টিনের চালার উঁপরে পড়ে জমে থাকা শুকনো হর্তুকী পাতার কিছু গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, কিছু শব্দ করে গড়াতে গড়াতে কোথায় আটকে গেল। সামনের রাস্তায় ধুলো উঠল ঘুরে ঘুরে। গাছতলার পাতাগুলো ক্ষণকয়েক গড়াগড়ি দিয়ে স্থির হল।

পানু দত্ত দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফাঁকা মাঠে ক্রমে মানুষ দেখা গেল। পানু দত্ত অপলক দেখছে। কে আসছে অমন দ্রুত, অমন ঝুঁকে। গোঁসাই বাড়ির ললিতের মতো অনেকটা। না, ললিত নয়। তবে কি রামধুপীর ছেলে তিনকড়ি? না, তিনকড়ি অত লম্বা নয়। নিশ্চয়ই রায়মল্লদের সুরেন। না, এ প্রতাপ মাস্টার। লোকটা ক্রমে এগিয়ে আসছে। পানু দত্ত ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল। না, প্রতাপ মাস্টার বলে ত মনে হচ্ছে না। তা হলে!—বটো?

—আজ্ঞে।

—ঐ লোকটা কে বল ত?—আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে বলল—বড্ড চেনা মনে হচ্ছে।

বটো একটু হেসেই বলল—আজ্ঞে হরি।

—কে?

—আজ্ঞে হরিপদ।

পানু দত্ত পলকে উঠে দাঁড়াল।

—উঠলেন যে!

—উঠি। বেলা পড়ে এল, একটু ঘুরিফিরি। পানু দত্ত হনহন করে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

নিশ্চয়ই হরি শহরে যাচ্ছে। কিন্তু এই অবেলায়। কি এমন রাজকাজ পড়েছে

যে, বিকেলে শহরে যেতে হবে? আবার ভাবল, হয়ত কাজ আছে। কিন্তু সকাল থেকে একবারও বললে না ত। আমি কি—

না, তার চেয়ে বড় কথা, পানু দত্ত হরিকেও চিনতে পারে নি। যাকে মানুষ করল নিজের হাতে, যাকে অষ্টপ্রহর চোখের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখল, তাকেও চিনতে পারল না। কি এমন দূরে ছিল হরি? ঐ ত বাঁশের সাঁকো ডিঙোচ্ছে, অথচ? পানু দত্ত নতুন ভাবনায় প্রায় মুষড়ে পড়ল। তা হলে চোখ একেবারেই গেছে! যাবেই ত! দত্ত ভাবল, বয়স ত কম হল না। হরিরই বয়স হল পঁয়ত্রিশের উপর। পানু দত্ত জোরে জোরে জোরে পা ফেলতে লাগল।

কিন্তু কোথায় যাবে? অবশ্য সামনের বটতলায় কিছুক্ষণ বসা যায়, অথবা পানাপুকুরের পাড়ে। না, তার চেয়ে ভাল রতন মুন্সীর ঘাটের চাতালে গিয়ে বসা। সেখানে নিশ্চয়ই দু-একজন পরিচিত লোক থাকবে। বরং তাদের সঙ্গেই গল্প-গুজব করবে বসে বসে।— একা থাকলে নিজের ভাবনাই কুরে খাবে। না, নিজের ভাবনা আর নয়। বয়স অনেক হল।

পানু দত্ত ইচ্ছে করেই ডান পা টাকে ধুলোয় ঘষে দিল। কিছু ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে হাওয়ার উল্টোদিকে হেলে পড়ল। আবার বাঁ পা-টা টানল। এবারেও সেই। দত্তর বেশ লাগছে। তাই সে বার বার একই ভাবে পা টানতে লাগল। ধুলো উঠল, হেলল।

পানু দত্তর ভাল লাগছে।

একটা হাটুরে লোক তরকারির বাঁক কাঁধে প্রায় ছুটে চলছিল, সে একবার ঘাম মুছতে মুছতে পানু দত্তর পায়ের দিকে তাকিয়ে যথারীতি চলে গেল। পানু দত্ত একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিজের পা জোড়া দেখল। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মোজা পরিয়ে দিয়েছে। পানু দত্তর খুব খুশি লাগল। সে ঘাট পর্যন্ত গেল না। ধুলোর মোজা পায়ে বটতলাতেই বসে পড়ল।

বটতলা একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। গাছের উপরে কয়েকটা কাক-পক্ষী এ-ডাল ও-ডাল করছে। মাঝে মাঝে বটফল ঠোকরাচ্ছে। দু-একটা পানু দত্তের পায়ের কাছে, গায়ের কাছে পড়ল। পানু দত্ত তার একটা কুড়িয়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুঁড়ল। পাখিগুলো নড়ে চড়ে বসল অন্য ডালে।

বেলা আরো ভাঙছে। পানু দত্ত বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অনেক ধুলো উড়িয়ে শহরের একটা বাস শিয়ালবুক্কার দিকে চলে গেল। একটু

পরে উল্টো দিকের একটা বাস শহরের দিকে।

হরি নিশ্চয়ই এ-বাসে শহরে যাবে। পানু দত্ত একবার সেদিকে তাকাল। অজস্র ধুলোয় বাসটা ঢেকে গেছে। নিশ্চয়ই হাত দেখাবে হরি। পানু দত্ত ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ওর মনে হল, বাস থেমেছে নন্দীর ঘাটে। বাসের শব্দ হল, চলে গেল।

পানু দত্তর হঠাৎ চোখজোড়া জলে ভরে গেল। তার ইচ্ছে হল, ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কিন্তু কেন, কিসের জন্য বুঝতে পারল না। দুঃখ তার অনেক, অনেক। কিন্তু সেজন্যে কি। না, পানু দত্তের মনে হল. তার জন্যে নয়। কিন্তু কি জন্যে, ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তবু হাতের তেলো দিয়ে চোখ জোড়া মুছল। তারপর ভাবতে লাগল—এত কান্না পাচ্ছে, এ কি রাগে, ক্ষোভে, নাকি অন্য কিছুর জন্যে? পানু দত্ত ঠিক-ঠিক কিছুই ভেবে পেল না। হাঁটুতে মুখ গুঁজে পানু দত্ত তাকিয়ে রইল রাস্তার ধারের প্রায় শুকিয়ে আসা খাদের দিকে, যার অনেকটুকু কলমী লতায় ঢাকা, মাঝখানে জল টলটল করছে এবং যে-জল হঠাৎ ছোট জাতের মাছের লেজের ঝাপটায় নড়ে চড়ে স্থির হচ্ছে। পানু দত্ত একটা বটফল কুড়িয়ে সেই জলে ছুঁড়ে দিল। চারিদিকে বৃত্ত গড়ে ফলটা স্থির হয়ে ভাসতে লাগল জলে। পানু দত্ত আরেকটা ছুঁড়ল। আরো একটা।

বিকেল আরো গড়াল। হাটুরে লোক হাটে যাচ্ছে। রাখাল ছোঁড়াগুলো গাঁয়ের দিক থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে রাস্তার দিকে। পানু দত্তর কাছারীর কথা মনে পড়ল। হাকিম নিশ্চয়ই এতক্ষণ উঠি উঠি করছে। উকিল বাবুরাও। অবশ্য খাসমাহাল এখনো খোলা আছে। সাব-রেজিস্টারের অফিসও। নিশ্চয়ই নেতা, বিপিন, দেবেন সবাই খুব মক্কেল ঘাটাঘাটি করছে। করবেই ত। পানু দত্ত আরেকটা বটফল ছুঁড়ে মারল জলে, আর ভাবল, নিশ্চয়ই স্বভাব। নইলে কি এমন আয় হত ওসব মামলায়। কিছুই না। তবু মিছিমিছি মক্কেল ক্ষেপানোতে মেতে রইল কেন? অথচ উকিলবাবুরা কতবার কেস নিতে অরাজী হয়েছে, তবু পানু দত্ত নাছাড়। দত্ত নিজের সর্বনাশা স্বভাবের জন্য লজ্জিত হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার এও মনে হল, শুধু একতরফা দোষ-ই দিই কেন? নুরু কি অরাজী ছিল, অথবা সনাতন? অবিনাশ ত নিজে থেকেই বলল মামলার কথা। বুদ্ধি নিশ্চয়ই পানু দত্ত

দিয়েছে, কিন্তু এক হাতে ত তালি বাজে নি। মিথ্যে মামলা নিজের জন্যে সাজায় নি সে। মক্কেলেরও সায় ছিল। অবশ্য তাদের শাস্তি হয় নি তা নয়, কিন্তু হাকিম সঙ্গে সঙ্গে তাকেও শাস্তি দিয়েছেন। হুকুম দিয়েছেন, দত্ত-বাবুর তম্বিরী কেস যেন আর না নেয়া হয়। মক্কেলরা ছিটকে সরে গেল। কাছারীর সবাই ছি-ছি করল পানু দত্তকে। তারপরও পানু দত্ত খাসমাহালে কি রেজেস্টারী অপিসে যেতে পারত। পারত-ই ত! কিন্তু ব্যাপারটা হু হু করে ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে। লজ্জা। লজ্জা! শুধু চক্ষুলজ্জায় আর ওদিক যেতে পারল না। লোকে যা-নয় তাই বললে। পানু দত্ত কানে তুলো দিয়েছে; কালা সেজেছে। কি করবে সে? লোকের মুখের উপর ত আর ট্যাক্স নেই। পানুর দত্ত মনে হল, সবই অদৃষ্ট, নইলে ছেলেও মুখের উপর সাতকথা শুনিয়ে দেয়!

হাঁটু থেকে মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকাল। না, এখনো অনেক বেলা। এখনো রোদ্দুর হেসে খেলে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। অথচ আগে আগে কখন যে দিন ফুরিয়ে যেত, কিছুতেই টের পেত না সে। আর এখন দিন যেন আর ফুরোতে চায় না। কিছুতেই না। পানু দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে হল, হাকিমের একটি হুকুমেই তার গত জীবনের সব মিথ্যে হয়ে গেছে, এমন কি সে নিজেও। পানু দত্ত উঠে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছে, তার যেন আর দম অবশিষ্ট নেই। কিসের যেন একটা দলা বুক বেয়ে গলায় এসে আটকে যাচ্ছে। পানু দত্ত একমুহূর্ত দাঁড়াল। সত্যিই অস্বস্তিটা ক্রমে বাড়ছে। ক্রমে তার মনে হচ্ছে, এই রোদ্দুর জড়ান মাঠ-ঘাট, গাছ-পাতা-আকাশ, সব যেন ক্রমে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন দাম নেই, কিচ্ছু নেই। সব নিরর্থক, সব মিথ্যা।

তার আর কিছুই ভাল লাগছে না। তবু সে হাঁটছে। কিন্তু এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছে সে, কোথায় যাবে? যদি একটু জল পাওয়া যেত, এক কাপ চা। না, চা খাবার পয়সা পকেটে নেই। পানু দত্ত ঘুরে দাঁড়াল। সে রতন মুন্সীর ঘাটেই যাবে। হাত-মুখ ধুলে হয়ত মনটা ঠাণ্ডা হবে, মাথাটা স্থির। পানু দত্ত জোরে পা চালাল। ঘাটের কাছাকাছি হবার আগেই তার মনে হল না, সে বাড়িতেই যাবে। কেন যাবে, কিজন্যে যাবে, সে ভাবল না। শুধু মনে হল, ঘাটের চাইতে ঘর ভাল। সে মুখ বুজে পড়ে থাকবে বিছানায়, নতুবা বসে থাকবে পশ্চিমের বারান্দায়। আর কিছু না হোক, নাতি-নাতনীগুলো ত আছে।

ওদের সঙ্গে বসে বসে কড়ি খেলবে, কি গল্প করবে, নয়ত চোর-চোর খেলবে, নতুবা ঘোড়া সাজবে।

পানু দত্ত সরকারী রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল।

মাঠটা চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের রোদ্দুর গিলছে। পানু দত্ত সারা শরীরে রোদ্দুর শুষতে শুষতে ধুলোপায়ে উঠনে এসে দাঁড়াল। কোথাও কেউ নেই। নাতি-নাতনীদের কেউ না। পায়ের শব্দ পেয়ে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে গেল। ধুলো উড়ল। পানু দত্ত মুখঘুরিয়ে গোয়াল দেখল। ফাঁকা। নিশ্চয়ই সবাই গরু নিয়ে মাঠে গেছে। হরির ঘরের দিকে তাকাল। দরজায় শিকল তোলা। বউমা হয়ত কারো বাড়ি গেছে। পানু দত্ত ধুলো পায়ে নিজের ঘরের বারান্দায় উঠে এল। চারিদিকে শব্দহীন এক স্তব্ধতা ঘুমিয়ে আছে। একটা পাখি, কি একটা কুকুরও ডাকছে না কোথাও। কেন, কি হল? পানু দত্ত গলা বাড়িয়ে পেছনের পুকুর দেখতে চেষ্টা করল। না, ওদিকেও কোন শব্দ নেই। চাষের লোকগুলোরও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সব, কোথায়? অস্বাভাবিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় পানু দত্ত প্রায় মরিয়া হয়ে উঠল। তার মনে হল, সে আর দাঁড়াতে পারছে না। এক্ষুনি মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সে পা টেনে নিজের ঘরের দরজার ছিটকিনি খুলল। তারপর হাতের ধাক্কা দিতেই দরজা একেবারে খুলে গেল। আলো ঢুকল ঘরে। চোখ তুলে সামনে তাকাল পানু দত্ত। ঘরের ভেতরের একজোড়া চড়ুই শব্দ পেয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে গেল। পানু দত্ত পা দিল তার ঘরে। হঠাৎ একেবারে আচমকা ঘরের এক কোণে টাঙানো ছবিটার দিকে নজর পড়ল। অবহেলায় পড়ে থাকা ঝাপসা ছবিটার কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পানু দত্ত পায়ে পায়ে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল। কি আশ্চর্য! কত দিন এ ছবিটার কথা খেয়াল ছিল না তার। কতদিন! আজ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করল সে। পানু দত্ত পায়ে পায়ে একেবারে ছবির নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জানকীর মুখ, চোখ, শাড়ির পাড়। কি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে পানু দত্তর দিকে। পানু দত্তের মনে পড়ল সব, সবই। মরবার কয়েক মাস আগে যতীনকে ডেকে এনে এ-ছবি তুলিয়েছিল। কত মিনতি করেছিল

জানকী, ওকেও সঙ্গে বসার জন্যে। পানু দত্তর তখন সময় ছিল না, মনও নয়। পানু দত্ত অপলক ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল অনেক, অনেকক্ষণ। তারপর কখন সে নিজেও জানে না, একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তখন অন্ধকারে ছবি, ঘর সব ঝাপসা হয়ে গেছে। এমন কি পানু দত্ত নিজেও॥

দেশ/১ আশ্বিন॥ ১৩৬৯

ওবাইদুর রহমানের ইন্তেকাল

পুরো প°য়তাল্লিশ বছর ঘর করার পর ওবাইদুর রহমান দপ্তরী, যার পেশা বই বাঁধান নয় স্কুলের ঘন্টা দেয়া, হাজিরা খাতা ক্লাশে নিয়ে যাওয়া, নোটিশ টাঙান এবং পড়ান, ডাস্টার এবং চক গুছিয়ে রাখা, অফিসঘব ঝাট দেয়া ইত্যাদি, সেই ওবাইদুর রহমান, যার বয়স তেষট্টি, বড় ছেলের বয়স তেইশ, তারপরও ছ'ছটা ছেলে মেয়ের বাপ, ইতিমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, এবং পাঁচটা ছেলের একটারও বিয়ে দেয় নি, যদিও ছোট ছেলে দুটির একটি ইঁচড়ে পেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছে, একটা পড়ছে এবং বড় তিন ছেলে চাকরী করছে যথাক্রমে অফিস চায়ের দোকানে ও প্রেসে, সেই ওবাইদুর রহমান দপ্তরী হঠাৎ, হঠাতই প°য়তাল্লিশ বছর সুখে দুখে ঘর করেছে যার সঙ্গে, যাকে কোনদিন দূরে রাখার কথা ভাবে নি, তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে নি, প্রায় অকারণে সেই ফুলজান বিবিকে তালাক দিয়ে বসল ছেলেদের সামনে। বললে, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন। ব্যস্, পলক ফেলার আগেই এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হল ফুলজানকে। উঠনে পা রেখে পা বাড়াতেই বড় ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের সুমুখে, বললে, কদম বাড়াবি ত কসম আমার। প্রবীণা ফুলজানের তখনো ঘোর কাটেনি, মুখ তুলল, যেন বাজপড়া গাছ, মুখে কোন কথা সরল না। ছেলে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পাশের নতুন ভিটেয় সদ্য সমাপ্ত নতুন ঘরে, বললে, এ ঘর আমার আম্মা, এ ঘরে তুই থাকবি। বুড়োর ভিমরতি হয়েছে, আমি এর বদলা নেব। ছেলের কন্ঠস্বরে আঁতকে উঠল ফুলজান, ধমকে বলল, দোজখের ভয় নেই ? বাপ না তোর ?

—তাই বলে তোরে তালাক ! হোক বাপ, আমি ছাড়ব না।

—কি করবি, করবি কি তুই ? রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে ফুলজান ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আচমকা বোবা হয়ে গেল আমিনুর। সে এ অবস্থার মুখোমুখী হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল বারান্দায়। দাঁড়াল। দেখল মুজিবুর, সাইফুর শামসুর উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে এ ঘরের দিকে তাকিয়ে,

সফিকুর ছাড়া বাছুরটার গায়ে হাত রেখে স্থির। সে কিছুই ঠাওর করতে পারে নি। আমিনুর উঠোনে নেমে বলল, বাজার হাটে যা, যা যা লাগবে নিয়ে আসবি। সফিকুরকে ডেকে বলল, ঘরে যা, আম্মার কাছে বসবি, যাবি না কোথাও।

পায়ে পায়ে উঠোন ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ল। ভাবল, এ ঘটনা আদৌ ঘটত না যদি সে জেদ না ধরত। আসলে দায়ী সে, তার জেদ। এবং ফলে যা ঘটল তা আমিনুর স্বপ্নেও ভাবে নি। আমিনুর বুঝল এর আর শোধরানোর উপায় নেই। যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

অথচ সে এমন করল কেন? আজ নতুন ঘরে না গেলে কি এমন দোষ হত? কেন সে মরিয়া হয়ে উঠল. কেন সে বলল, নিজে দিনক্ষণ ঠিক করে আবার উল্টালে যে?

—আমার খুশি। নিরুত্তাপ জবাব দিল ওবাইদুর।

—হঠাৎ হঠাৎ খুশির রঙ বদল ভাল না।

—মন্দ কি রে উল্লুক।

—চাষার মতো গাল দিও না কই।

—অরে আমার নবাবের বেটা, গাল দেবে না। কেন্ তর খাই না পরি। খুশি, আমার খুশি, যাব না।

—তখন মত দিলা কেন্? ফুলজান মুখ খুলল।

—অ, তরও এই মত!

ফুলজান বলল, ছেলেরার সখ, গেলামই বা। তা ছাড়া—

—মানে তুই যাবি।

হ—রেগে জানাল ফুলজান। বলল—ঢঙ!

ফুলজানের শেষ কথায় বুড়োর মাথায় রক্ত চেপে গেল, জেদ। বলল, আমার কথা কথা না?

—তা কেন্, ছেলেরার সখ।

—সেটাই বড় হইছে?

আমিনুর ফেটে পড়ল, বুড়ো হইছ, তবু গোঁ গেল না।

—এই কথা?

ফুলজান ফুঁসে উঠল, বলল, কথায় কথায় গোস্যা ভাল না।

কি, কি বললি? তবে রে—সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল তিন তালাক, বাইন।

সাক্ষী খোদাবক্স, ওবাইদুরের খালুতে ভাই, আর ছেলেরা।

খোদাবক্স বলল, এ কি ভাইজান, ফিরাই লও কথা, ফিরাই লও। আমি ঘরের লোক, ডর নাই।

বৃদ্ধ ওবাইদুরের গলা থেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হল, না।

অথচ গতকাল সন্ধ্যাতেও ঠিক ছিল সবই। ওবাইদুর নিজে সায় দিয়েছে ছেলেদের মতে। বলেছে, ঘরের কাম ত শেষ হয়ে গেছে, আর দেরী করে লাভ কি?

আমিনুর বলেছে, তাছাড়া এ ঘরের ছাউনি একেবারে গেছে। এই ফাঁকে এইটা সারাই হয়ে যাবে।

ওবাইদুর হেসে বলেছে, সারাইয়া কাম কি! তার থেকে বেড়াগুলান খুলে ওঘরের ছাদে লাগান যাক।

এখানে ঘর থাকবে না?—আমিনুর শুধিয়েছে।

খুঁটির ওপর চালা দিয়া গোয়াল হক।

তা মন্দ না। সায় দিয়েছে আমিনুর। ফুলজানও না করেনি। কিন্তু একটি রাত্রির মধ্যে এমন হল কেন আমিনুর ভেবে পেল না। বুঝতে পারল না কেন হঠাৎ বেঁকে বসল। বুড়োর মাথা কি একেবারেই গেছে! নইলে—

সন্দেহ যে মাঝে মাঝে হয়নি তা নয়, কিন্তু এত বিগড়েছে আমিনুর ভাবতে পারেনি। অথচ ঘরের সব কাজই হয়েছে ওবাইদুরের নিজের তদারকীতে। মজুর লাগান, জিনিসপত্তর কেনাকাটা, সবই। শুধু টাকা জুগিয়েছে আমিনুর, মুজিবুর, সাইফুর। পছন্দের যা কিছু বুড়োর। এমন কি চালায় টিন না টালি, তাও বুড়োই ঠিক করেছে, ছেলেদের রা করতে দেয়নি। সেই বুড়ো হঠাৎ বিগড়ে গেল; শুধু বিগড়ালেও কথা ছিল, যা ঘটে গেল তা কোনদিন ভাবতে পারেনি আমিনুর, কল্পনাও করেনি।

ওবাইদুর রহমানের কাছেও এ অভাবিত। এমন করে তালাক দেবে একথা কোন একটি মুহূর্তেও ভাবেনি। পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে কত ঘটনা দুর্ঘটনা রাগারাগি ঝগড়াঝাটি হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, উন্মত্ত হয়েছে, ঠেঙিয়েছে পাগলের মতো, জিনিসপত্তর ভেঙে তছনছ করেছে, কিন্তু একটি দিনের একটি মুহূর্তেও তালাক দেবার কথা ভাবেনি ওবাইদুর। অথচ পাড়ার কতজন কতবার তালাক দিয়েছে বিবিকে, হাতবদল করে নিকে করেছে আবার, কিন্তু ওবাইদুরের তালাক দেবার মনটাই যেন ছিল না। অথচ সেই

ওবাইদ্দুর রহমান দপ্তরী পঁয়তাল্লিশ বছর ঘর করেছে যার সঙ্গে তাকে হঠাৎ বুড়ো বয়সে তালাক দিয়ে বসল। কেন দিল ?
ওবাইদ্দুর নিজে জানে না কেন তার মুখ ফসকে এমন কথা বেরিয়ে গেল ? সে কি ছেলেদের রোজগারে তৈরি ঘরে যেতে পছন্দ করে না ? সে কী আমরণ নিজের ঘরে থাকতে চেয়েছিল ? কোথাও কি তার সম্মানে বাধছিল ? ওবাইদ্দুর রহমান হয়ত অত ভাবেনি।.
কবেই বা ভেবেছে ওবাইদ্দুর ! পঁয়তাল্লিশ বছরের সংসার জীবনে শুরুর চার-ছ' বছর ছাড়া ফুলজান ওকে একবারও সংসারের কথা ভাবতে দেয়নি। কি করে সংসার চালিয়েছে জানে ফুলজান, ওবাইদ্দুর জানতে চায়নি। সকাল নটায় স্কুলে গেছে, ফিরেছে সাঁঝের নমাজের পরে। এসে বসেছে কোরাণ নিয়ে, এক সময়ে পড়া শেষ হতেই খেয়ে শুয়েছে এবং ঘুমিয়েছে। ফুলজান কোনদিন বলেনি অভাবের কথা, স্বভাবের কথা। যা হাতে তুলে দিয়েছে তা দিয়ে ছেলে সোয়ামীর পেট ভরে দিয়েছে। কোনদিন জোর করে সোহাগ চায়নি, সোনা রুপো চায়নি, ভাল একজোড়া কাপড়ও নয়। আঘাতের প্রতিবাদে আঘাত করেনি, রেগে গেলে ফুলজান বোবা হয়ে থেকেছে। এমন কি মারধোর খেয়েও কখনো চেঁচায়নি। গাঁয়ের কেউ বলতে পারবে না আমিনুর ওরফে নুরুর মার কখনো গলা শুনেছে। হয়ত শেষ বয়সে এই-ই নসিবে ছিল ফুলজানের, ওবাইদ্দুরের। হয়ত এই-ই খোদার ইচ্ছা, তাঁর মর্জি।
এতক্ষণ বেড়ায় হেলান দিয়ে একভাবে বসেছিল ওবাইদ্দুর। খোদা মেহেরবান ! —বলে উঠে দাঁড়াল। একবার মসজিদে যাবে।
অসময়ে ওবাইদ্দুরকে মসজিদে আসতে দেখে অবাক হলেন মৌলভী সাহেব। বললেন—অসময়ে ?
ওবাইদ্দুর সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, সজ্ঞানে সে বিবিকে তালাক দিয়েছে।
সে কী ! এই বয়সে ? বিস্মিত হলেন মৌলভী সাহেব। জিজ্ঞেস করলেন, মোহরের টাকা ?
—চাইলেই দেব।
হ্যাঁ দিয়েই দেবে। বিয়ের সময় কথাই ত ছিল। সে আর এমন কি ! দশ মোহর মাত্র। কটা আর টাকা !
ওবাইদ্দুর আর কোন কথা না বলে সামনের পুকুর ঘাটে গেল, অজু করল,

ঢুকল মসজিদে। নামাজ পড়ল আপন মনে। বেরিয়ে যখন এল তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে ওবাইদুরের বুড়ো বয়সের কীর্তির কথা। বলা বাহুল্য সবাই ছি ছি করল। বলল, ভীমরতি হয়েছে বুড়োর।

তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ ওবাইদুর কিছুই কানে তুলল না। সামনের বটগাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই রইল।

এখান থেকে স্কুল বাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়। হঠাৎ মনে হল তাকে স্কুলে যেতে হবে, অফিস খুলতে হবে প্রতিদিনের মতো, ঝাঁট দিতে হবে, গুছিয়ে রাখতে হবে চক ডাস্টার, হাজিরা খাতা নিয়ে ছুটতে হবে ক্লাসে ক্লাসে, ঘণ্টা দিতে হবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

ওবাইদুর দ্রুত বাড়ীর দিকে পা চালাল। পুকুর পাড় থেকে নেমে চৌধুরীদের উঠোন ডিঙিয়ে পেছন দিক দিয়ে ভিটেয় পা দিল। ঘরের সামুখে যেতেই দেখল দরজা খোলা, ঘরে ঢুকে চাবি রাখার জায়গায় হাত দিতে তার মনে পড়ল আজ রবিবার, স্কুল নেই। তবে যে ছেলেদের দেখল বই হাতে রাস্তা দিয়ে যেতে? ওরা এল কেন? ওবাইদুর মনে করতে চেষ্টা করল আজ কি বার? না, ঠিকই রবিবার। গতকাল আধা দিন স্কুল হয়েছে। সে সকাল সকাল ফিরেছে বাড়ীতে। তাহলে? নিশ্চয়ই ওরা মাদ্রাসার ছাত্র। ওবাইদুরের মনে পড়ল সেইসব ছেলেদের মাথায় টুপি ছিল।

ওবাইদুর হাত নামিয়ে তাকাল বাইরে। উঠোনে রোদ্দুরের হাট বসেছে। বেলা কত হল কে জানে? ওবাইদুর ভেতরের ঘরে উঁকি মারল। না, কেউ নেই। ছেলেপিলেরা গেল কোথায়, নুরুর মা? অ নরুর মা, নুরুর মা—অস্ফুট ডাকল ওবাইদুর রহমান। কেউ সাড়া দিল না।

আরো জোরে ডাকতে যেতেই মনে পড়ল, ফুলজানকে তালাক দিয়েছে সে, আজ সকালেই, ওর ত এখানে থাকবার কথা নয়। কিন্তু ছেলেগুলো? ওরাও কি মায়ের সঙ্গে চলে গেছে? নিশ্চয়ই গেছে, নইলে একটাও নেই কেন? ওবাইদুর রাগে, ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে গেল মুহূর্তেই। এ কি রকম হল? আইন কি বলে?

যে লোক জীবনে মুসলমানী তালাক আইনের ক অক্ষরেরও খবর রাখল না, সে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল আইনের কথায়। ভাবল, সব ছেলে ত আর নুরুর মার নয়, ওদের উপর তারও দাবী আছে। তাহলে? কিন্তু ছেলেরা যদি মায়ের সঙ্গে থাকতে চায়? চাইলেই চলবে কেন? আইন আছে না? আইন কি কাউকে

ছেড়ে কথা কইবে ? ছেলেদের যে বয়স হয়েছে। হউক বয়স। ছেলের বয়স হলেও বাপের অধিকার যাবে কোথায় ? কিন্তু এ কথা কাকে জিজ্ঞেস করবে ওবাইদুর। কে বলে দেবে ছেলেদের উপর বাপের অধিকার কতটুকু ?

ওবাইদুর মাথায় হাত দিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ল। ভাবল, ভালই হয়েছে। যাক বউ, ছেলে, মেয়ে। চাই না তার। সে একাই থাকবে এই ঘরে, দুবেলা দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নেবে, ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, এই তার পক্ষে ভাল। ওবাইদুর রহমান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ভেতরের ঘরে ঢুকল।

এ ঘরটা রান্নাঘর।

গতরাতে নুরুর মার গুছনো বাসন-পত্তর তেমনি সাজানো আছে। উনুনটা খাঁ খাঁ করছে আগুনের অভাবে। শিকেয় কি যেন তুলে রাখা আছে। কি ? ওবাইদুর হাত বাড়াল। শুটকীর হাঁড়ী। ওদিকের শিকেয় ? হাত দিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে আনল। পুরনো তেঁতুল। হাসি পেল ওবাইদুরের। নুরুর মার ওই এক সোহাগের খাবার। তেঁতুল খুব খেত নুরুর মা। কেন খেত সে ওবাইদুর জানে না। কতদিন ঠাট্টা করেছে, ফুলজান কিন্তু ঠিক চুক্ চুক্ করে চুষেছে। বলেছে, খেয়ে দেখ না, তোমার ও ভাল লাগবে। ছাই, জবাবে বলত ওবাইদুর। তারপর নুন মাখানো তেঁতুল এগিয়ে দেয়া হাতটাকে ঠেলে দিয়ে বলত, কি আমার খাবার। দিন রাত্তির চাটছ।

উঁ হুঁ হুঁ। ফুলজান চোখে চোখ রেখে মুখে স্বাদের সুর তুলত।

ওবাইদুর হাঁড়িটা যথাস্থানে রেখে দিল। ভাবল, এখনো কি তেঁতুল খাবার অভ্যেস ফুলজানের আছে ? কে জানে ? যদি থাকে। ওবাইদুর ভাবল, এক সময়ে ছেলেদের ডেকে তেঁতুলের হাঁড়িটা দিয়ে দেবে। বলবে, এ দিয়ে আমি কি করব, নিয়ে যা তোদের মাকে দিস্।

যদি ছেলেরা না নেয় ? তাও ত বটে! যদি না নেয় উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। অত পরোয়া করে না ওবাইদুর। না হয় বয়স হয়েছে, তাই বলে তেজ ত এখনো যায়নি।

ওবাইদুর ঘরের কোনার জ্বালানী কাঠের জায়গায় চোখ রাখল। অ খোদা! ঘরে ত কাঠের বংশও নাই। তা হলে কি দিয়ে উনুন ধরাবে ওবাইদুর ? রান্না চাপাবে কি করে ? অথচ বেলা হচ্ছে। কিছু যদি খেয়াল থাকে নুরুর মার! এত বেখেয়াল নিয়ে সংসার চালাতো কি করে ? না এ অসহ্য! এখন কোথায় পাবে কাঠ, কোথায় কুটো! তাছাড়া দিন দুই আগেও বৃষ্টি হয়েছে,

এখন কি কুড়নো কাঠে আগুন ধরবে ? ধরুক না ধরুক, কাঠ-কুটো ত চাই। ওবাইদুর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নতুন ঘরের পাশ দিয়ে ভিটের পশ্চিমে যেখানে খড়ের গাদা, ঝিঙের মাচান, সেদিকে এগিয়ে গেল কাঠের খোঁজে। ভেঙে পড়া ঝিঙের মাচানের কিছু কাঠি খুলে নিলে, ভাঙল পায়ের চাপ দিয়ে। একটা আধ শুকনো মাদারের ডাল পড়ে ছিল খাইয়ের পাশে, সেটা কুড়িয়ে নিল। আরো কাঠের খোঁজে পা বাড়াতেই চমকে পা সরিয়ে নিল ওবাইদুর। এ কি !

সত্যি, অনেক ওল। (এ গল্প যে অঞ্চলের সেখানে ব্যাঙের ছাতাকে ওল বলে। দুজাতের, যথাক্রমে হাঁসা এবং খড়ো ওল—ও অঞ্চলের লোকেদের প্রিয় তরকারী। আগে ওল মুসলমানরা খেত না, একালে খায়। অবশ্য গাঁয়ের সাধারণ মুসলমানরা।) প্রায় ফুটি ফুটি। ওবাইদুর আলতো হাতে চার ছটা তুলে নিল। আরো তুলতে যেতেই হঠাৎ ওবাইদুরের মনে পড়ল নুরুর মার কথা, ছেলেদের কথা। ওরা বড্ড ভালবাসে। কিন্তু সে যদি সব তুলে নেয় ওরা কি নেবে ? যদি না নেয়। ওবাইদুর যে কটা তুলেছিল সেগুলো হাতে নিয়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল। কি ভেবে আবার ফিরে এসে কাঠকুটোগুলো তুলে নিল এক হাতে। এদিক ওদিক একবার তাকাল, এবং শেষে চোখ রাখল নতুন ঘরের জানালার দিকে। না, খোলা জানালার কাছে কেউ নেই। কাকে ডেকে বলবে ওবাইদুর ? একটু ভেবে নিয়ে সে বেশ জোরে জোরে বলতে লাগল, খড়ের গাদার পাশে এত খড়ো ওল, অথচ বাড়ীর কারো চোখে পড়ে না! বলি, সকলে কি অন্ধ! একটু চোখ মেলে চাইলেই হয়। একটু থামল। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল এর প্রতিক্রিয়া। না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।—বেলা বাড়লে সবগুলান ফুটে যাবে, তখন আর খেতে হবে না। তাছাড়া একা আমি কটা খাব। যার খুশি সে তুলে নিক।

ওবাইদুর আবার থামল, উৎকর্ণ হল। না, কোন সাড়া শব্দ নেই। ছেলেদের কাউকে দেখছে না। গেল কোথায় ?

মরুক গে! আমার কি ? ওল ফুটেছে তাই বলা, নইলে ফুটুক ফাটুক বয়ে গেছে! বছর কালে হঠাৎ ফোটে, সখ করে খাওয়া বইত নয়। তা যার ইচ্ছা সে খড় গাদার পাশ থেকে তুলে নেবে। আমার আর কি! এই ত ছ'টা তুলে এনেছি, এই-ই ঢের। ওবাইদুর ওলগুলো উঁচু করে ধরে ঘরে ঢুকে গেল। কাঠ-কুটো মেঝেয় ফেলে একবার উঁকি দিল বেড়ার ফোকর দিয়ে। না, কারো

খেয়াল নেই। শুয়োরের বাচ্চাগুলো, সব মরেছে। মরুক। ওলগুলো মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলল। ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল মুহূর্তে। দূর ছাই। নুরুর মাও কি শুনল না? হয়ত শোনেনি। শুনুক না শুনুক, ওবাইদুরের কি। বলার ছিল বলেছে, ব্যস, তার দায়িত্ব খতম। শুনলে সবাই খেতে পেত, এখন পাবে না। ওলগুলো ফুটে যাবে, পোকায় ধরবে, তখন পস্তাবে।

যা ইচ্ছে ওরা করুক, ওবাইদুরের অত ভাবনার কি? ওবাইদুর উনুন ধরানোর জন্যে তাক থেকে কেরোসিনের বাতিটা নামিয়ে আনল। কাঠকুটোগুলো এনে জড়ো করল উনুনের পাশে।

দেশলাই।

ঐ এক দোষ নুরুর মার। দেশলাই যে কোথায় রাখে? ওবাইদুর এখানে ওখানে সবখানে চোখ বুলোল, অবশেষে একে একে হাত দিল তাকে সাজান সব কটি হাড়ির মধ্যে। না, কোথাও নেই। শুয়োরের বাচ্চাদের জ্বালায় চোখের সামনে কি দেশলাই রাখার জো আছে! সবকটাই বিড়ি ফোঁকে, দেশলাই কেনে না।

ওবাইদুর এদিক-ওদিক সবদিক তন্নতন্ন করে খুঁজল। না কোথাও নেই।

অ, নুরুর মা, বলি, দেশলাইটা কোথায়?

প্রত্যাশিত উত্তর না আসাতে একেবারে ক্ষেপে গেল। শালার আমার হয়েছে জ্বালা। বলি, দেশলাইটা কোথায়?

ওবাইদুরের মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে এল। সত্যিই ত তালাক দেয়া বউ তার কথার জবাব দেবে কেন? সে হতাশায়, ক্ষোভে একেবারে ভেঙে পড়ল। মেঝেয় বসতে যেতেই নজরে পড়ল বেড়ার কোণায় উঁকি মারছে দেশলাই।

বাতি ধরিয়ে মাচানের কাঠিগুলো ধরলে আলোর ওপর। অনেকক্ষণ ধরেই রইল। তবুও ধরল না। আরেক জ্বালা। ওবাইদুর বাতি থেকে কিছু কেরোসিন ঢেলে দিল কাঠিগুলোর উপরে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই উনুনে গুঁজে দিলে। মাদারের ডালটাকে ঢুকিয়ে দিল উনুনে। বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

এবার ধরুক আগুন, ওবাইদুর ভাবল—আগে কি বসাবে? চাল না ডাল? না, চাল ফোটাবে আগে, ওল কটা ভেজে নেবে, দুটো শুটকী পুড়ে এ বেলার মত চালিয়ে দেবে। ও বেলায় হাটে গিয়ে তরিতরকারী নিয়ে আসবে, তখন ভাল করে রান্না করা যাবে।

ওবাইদুর মনে করতে চেষ্টা করল চালের ভাঁড়ারটা কোথায় ? হঠাৎ মনে পড়ল চাল থাকে গলাবন্ধ টিনে। ওবাইদুর শোয়ার ঘরে ঢুকে একমালা চাল নিল ধুচুনিতে। এবার পুকুরে যেতে হবে, খাবার জল আনতে হবে, রান্নার জল, এবং চাল ধুতে হবে। ওবাইদুর রহমান বালতি কলসী চাল নিয়ে পুকুরে গেল।

এখন রোদ্দুর তেমন নেই। কেমন যেন মেঘ মেঘ করছে আকাশে। মেঘের ছায়া কাঁপছে জলে। ওবাইদুর কলসী ধুতে ধুতে জল থেকে চোখ তুলল। কয়েকটা পাখী উড়ে গেল ঝোপ থেকে। দূরে মেঘ জমেছে কালো হয়ে। আজ বৃষ্টি হবে, মনে হল ওবাইদুরের। হোক, ওবাইদুরের কি। ওবাইদুর চাল ধুয়ে জল নিয়ে ঘরে এল। ভাবল এখনো কি ওরা ওলগুল্যো আনে নি। নিশ্চয়ই এনে ফেলেছে। ওবাইদুর হাঁড়িতে চাল ঢেলে উনুনে চাপিয়ে দিল। নেড়ে চেড়ে দিল আগুনটা। একবার যাবে নাকি খড়গাদার ওদিকটায় ? ওবাইদুর ঘর থেকে বেরিয়ে খড়গাদার দিকেই গেল।

কি আশ্চর্য ! এখনো তোলেনি ! এই যা ! সব কটি ওল একেবারে ফুটে গেছে। একটু পরেই পোকা ধরবে, ফেটে-ফুটে তছনছ হয়ে যাবে। ওবাইদুর ভাবল, যাবে যাক্, ও কি করতে পারে ? তাছাড়া তুলে এনেও কি করবে সে অতগুলো ওল, খাবে কি করে। ওবাইদুর তবু গোটাকয়েক আলতো হাতে তুলল। নিয়ে আসতে আসতে আপন মনেই বকল। কেউ শুনছে ওর কথা এমন সাড়া শব্দ কোথাও পেল না। তবু ওবাইদুর চড়া গলায় বকে গেল, হাতে নাড়াচাড়া করল ওলগুলো, যেন চোখে পড়ে।

ওবাইদুর ঘরে এসে ঢুকল।

ঘর আরো অন্ধকার হয়ে গেছে। মেঘ করার দরুন বেড়ার ফোকর দিয়ে আসা আলোর রেখাগুলো মুছে গেছে একেবারে। ওবাইদুর ভেতরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটা হোঁচট খেল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে গেল কোন মতে। সে কী ! উনুনের আগুন নিবে গেছে ! দ্রুত কয়েকটি কাঠি গুঁজে এদিক-ওদিক তাকাতেই নজরে পড়ল মাচানের ওপর অনেক ঘুঁটে-কাঠি, কাঠ, কুটো। ওবাইদুর নুরুর মার বুদ্ধির তারিফ করল মনে মনে, কিছু ঘুঁটেকাঠি, কুটো নামিয়ে উনুনে গুঁজল, ফুঁ দিল বার কয়েক। সামান্য চেষ্টায় আগুন ধরল। ফুটছে। ওবাইদুর তাড়াতাড়ি ওল কুটল, শুঁটকীর হাঁড়ি নামিয়ে শুঁটকী বের করল।

কিন্তু মশলা ? ওলে কি মশলা দেবে ? শুটকী পোড়ায় পেঁয়াজ লাগবে, লংকা,—নুনের টিনটা কোথায়, পেঁয়াজের হাঁড়ি ? ওবাইদুর হাতড়াল। লংকা, পেঁয়াজ, নুন পেল। কিন্তু ওল কি দিয়ে রাঁধে ? কি করে ভাজে ? শুধু তেলে ? না ত আরো কি কি যেন দেয়।

ওবাইদুর ফাঁপরে পড়ল। কি দেয় ? ধনে, জীরা, আদা, কি ? নাকি হলুদ মেখে ভাজে ? না, ওবাইদুরের মনে পড়েছে, একবার গরম মশলা দিয়েছিল ওলের তরকারীতে, গোস্তের মত খেতে হয়েছিল। অবশ্য ভাজা সীমদানা ছিল ওতে। কিন্তু সে ত তরকারী। ভাজায় কি লাগে ?

ওবাইদুর ডাকল—অ নুরুর মা, ওল ভাজায় কি মশলা দেব ?—যেন পাশের ঘরের থাকা লোককে ডাকছে। বলল, কৈ ? বললা না।

ওবাইদুর আবার সহজ হল, স্বাভাবিক। না, নুরুর মা এখানে নেই। সকাল থেকেই নেই! অথচ ওবাইদুরের বার বার ভুল হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘরেই আছে নুরুর মা, এইত সব গুছিয়ে রেখে গেল। ওবাইদুর এদিক-ওদিক তাকাল। সবখানেই নুরুর মার হাতের ছাপ, ফুলজানের গোছ-গাছের চিহ্ন। সবই সত্য, তবু নুরুর মা নেই। সে ভোরেই চলে গেছে।

গেছে যাক। ওবাইদুর হলুদ নুন মাখিয়ে তেলে ওল ছাড়বে। যেমন হবে তেমন হবে। খাবে ত সে নিজেই। ওবাইদুর শেষবার তুলে আনা ওলগুলোও কুটে ধুয়ে নিল।

হলুদ চাই যে!

হলুদ হলুদ হলুদ। এ হাঁড়ি, ও টিন, ও তাক, সব খুজেও এক ফোঁটা হলুদ পেলে না। ছিল না নাকি! ওবাইদুরের মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যের কথা! সফিকুরকে হলুদ এনে দিতে সাধছিল নুরুর মা। সে কি আনে নি! হয়ত আনে নি। আনলে যাবে কোথায় ?

হলুদ হলুদ হলুদ। ওবাইদুর আরেকবার খুঁজল। না, নেই। এখন ? আবার সে দোকানে যাবে! থাকগে, শুটকী পোড়া দিয়ে এ বেলা চালিয়ে নেবে, লঙ্কা পোড়া পেঁয়াজ কুচি আর একটু নুনে এবেলা হয়ে যাবে তার।

ওবাইদুর লঙ্কা গুঁজল উনুনে। উৎকট গন্ধ উঠল। তুলবার আগেই গোটা-কয়েক পুড়ে গেল। যে কটা তুলল, তুলতে পারল, তারও অনেকটুকু পুড়ে গেছে। যাক্। ওবাইদুর পেঁয়াজ কুটছে। প্রথমটা কুটতে কুটতেই চোখ জলে

ভরে এল। জামার হাতায় চোখ মুছল। তবু জল জল। চোখের কোল বেয়ে গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে ওবাইদুরের। ওবাইদুর কাঁদছে। পেঁয়াজ কোটা বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তেই।

যে মানুষটা ভেবেছিল একটুও ভাঙবে না, একটুও মচকাবে না,—সেই অসম্ভব তেজী বৃদ্ধ ওবাইদুর মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ভেঙে খান খান হয়ে গেল। সে প্রথমে নিঃশব্দে, পরে প্রায় হিক্কা তুলে কেঁদে উঠল। বার বার নিজের অবরুদ্ধ আবেগ চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বৃদ্ধ ওবাইদুর কান্নার হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। তার মনে হল, এত মমতা যদি মনে, এত প্রীতি, এত আকর্ষণ, তবে মুখ কেন এমন কথা উচ্চারণ করল যা মৃত্যুর অনিবার্যতা নিয়ে গুছনো সংসারকে মুহূর্তে তছনছ করে দেবে? কেন করল?

ওবাইদুর সে রহস্য জানে না, বোঝে না। সে ভাবতে পারে না একটি কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি মৃত্যুর মতো অমোঘ, দুর্ভাগ্যের মতো নিষ্ঠুর, নিয়তির মতো দুর্বার। সে জানে না আকস্মিক উচ্চারণে, হাসির উচ্চারণেও এর ফলভোগ অনিবার্য। কিন্তু কে এমন উচ্চারণ তাকে দিয়ে করিয়ে নিল? কে? ইয়া আল্লা! বলে ওবাইদুর সোজা হতে চাইল, শক্ত, কঠিন। কিন্তু দুঃখ দুঃখই, সে ত অশক্তকে ক্ষমা করে না, সে ত নিরীহকে এড়িয়ে চলে না। ওবাইদুর কপালে করাঘাত করে ডুকরে উঠল।

শেষ বয়সে এ কী করেছে সে? মরার সময় পানি পাবে না, রোগে শোকে কে তাকে সান্তনা দেবে, পাশে বসবে, কে বলবে এটুকু মুখে দাও।

না, কেউ-ই রইল না। তাহলে? কি হবে এ ঘরে, উনুনে, ভাতে? ওবাইদুরের ইচ্ছে হল লাথি মেরে হাঁড়ি, উনুন, কাঠ-কুটো তরিতরকারী সব তছনছ করে ফেলে।

না, লাভ কি? কেউ ত ফিরবে না। কাউকেই সে ফেরাতে পারবে না। অথচ পঁয়তাল্লিশ বছর…উফ্ খোদা বলে বেড়ার গায়ে ঢলে পড়ল। সে এমন করল কেন? তার কি মরণ ঘনিয়েছে, মৃত্যু? হায় আল্লা! ওবাইদুর চোখে অন্ধকার দেখল।

ভাত ফুটে প্রায় গলতে সুরু করেছে ওবাইদুরের খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হল তখনই নামিয়ে নিয়ে ফেন গালল।

এক সময়ে একবার উঁকি দিল বেড়ার ফোকর দিয়ে, যদি ফুলজানকে একবার দেখা যায়, যদি—। অনেকক্ষণ তাকিয়েও কাউকে দেখল না। শুধু সফিকুরকে দেখা গেল বারান্দায় ঘুরতে, আর দেখল কুকুরটাকে, দেয়াল ঘেষে শুয়ে আছে। ওবাইদুরের ওলের কথা মনে পড়ল। ওগুলো কি তুলেছে? ওবাইদুর বাইরে এল, ছুটে গেল খড়গাদার দিকে। না তোলে নি। সবগুলো ফুটে ফেটে গেছে। ওবাইদুর একে একে সবগুলো ওল তুলে লুঙ্গিতে নিল। না নিক ওরা, সে নিজে সাঁতলে রাখবে, কাল ভোরে মেয়েকে দিয়ে আসবে। সে নিশ্চয়ই নেবে। ওবাইদুর সবগুলো ওল তুলে উঠে দাঁড়াল। তাকাল এদিক-ওদিক।

মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশঃ। সে নিজের ঘরের দিকে তাকাল, ঘরের লাগোয়া কাঁঠালগাছটার দিকে। ওটার মাথার উপরে মেঘেরা বেগে বেগে ঘুরছে, উড়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

না, বৃষ্টি আসবে। ওবাইদুর পায়ে পায়ে ঘরের বারান্দায় উঠে এল। তাকাল ও ঘরের দিকে। এতক্ষণ সফিকুর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, চোখাচোখি হতেই ঘরে ঢুকে গেল। আপন মনে হাসল ওবাইদুর। নিশ্চয়ই ও ছেলেটাও জেনে ফেলেছে। নইলে ওভাবে চলে গেল কেন?

ওবাইদুর ঘরে এসে ঢুকল। বেলা এখন কত হয়েছে? কে জানে। এগার, বার…কই ক্ষিদে ত এখনো পায় নি। ওবাইদুর বড় মমতার সঙ্গে ওলগুলো কুটল। তারপর হাত ধুয়ে পোড়া শুটকী, পোড়া লঙ্কা, কুচন পেঁয়াজ নুন দিয়ে মেখে নিল, একটু তেল নিল আলতো হাতে।

এবার স্নান করবে ওবাইদুর। লুঙ্গি হাতে পুকুর ঘাটে গেল।

পুকুর তেমন বড় নয়, ছোটই। চারদিকের পাটিবেতের ঝাড় পুকুরের ভেতরে পর্যন্ত চলে এসেছে। ওবাইদুর জলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। ওপাশের ঝোপ থেকে কি একটা পাখী ডাকল। দু তিনটে ফড়িঙ চক্কর দিচ্ছিল জলের ওপরে, ওরা ক্রমে ওপরে, আরো ওপরে উঠে গেল। ওপাশটায় ছোট ফেনা হয়েছে। দু চারটে এলোমেলো ভাসছিল। ওবাইদুরের মনে হল ফেলে দেবার কথা। একদিন সে ফেলে দেবে। নইলে পুকর ভরে যাবে। এপাশের জারুল গাছের মগডালে বসে একটা চিল চিঁহি করে ডাকল।

আচ্ছা, ওরা কি রান্না করেছে, খাওয়া দাওয়া? কে জানে। ওবাইদুর ঝুপ করে জলে নেমে দুটো ডুব দিল। উঠতে উঠতে বললে, খোদা মেহেরবান।

দুপুরের খাওয়া সে না-খাওয়ারই মত। ভাত গলে গিয়েছিল একেবারে। ওবাইদুর সে গুলোই খেয়েছে। তারপর পুরো দুপুর, যখন বৃষ্টি এল তখনো ঘরের ভেতর এক ভাবেই বসেছিল। এক সময়ে তন্দ্রার মত আসতে তার মনে হল, কোথায়, খুব কাছে যেন খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজছে, কাঁসর। হকচকিয়ে উঠে বসল। না, কোন কিছুই নেই। আর থাকবার কথাও নয়। হিন্দুপাড়া ত অনেক দূরে। তাছাড়া এই ভরদুপুরে কাঁসা-ঘণ্টা বাজবে কেন? তাহলে? ওবাইদুর ভাবল এ মনের ভুল। সে আবার হেলান দিল বেড়ায়। আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই সে শুনতে পেল দীর্ঘ আজানের শব্দ। সে সোজা হল পলকে। কে আজান দিচ্ছে এই অসময়ে? কে? ওবাইদুর উৎকর্ণ হল। কৈ সেই শব্দ ত পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে? না, ও কিছু নয়, মনের ভুল— ওবাইদুর ভাবল।

তারপর কখন বেলা একেবারে মরে গেল, বৃষ্টিতে পথ ঘাট মাঠ ভিজে ভেসে গেল খেয়ালই ছিল না ওবাইদুরের। যখন খেয়াল হল তখন অন্ধকার চতুর্দিকে। বাইরে কিসের যেন ভীষণ কোলাহল। ওবাইদুর বাইরে এল। ঝড় উঠেছে, বৃষ্টি।

ও ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। ওবাইদুরের বাতি জ্বালানোর কথা মনে হল। আবার ভাবল, থাক। এত তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে কি হবে। ওবাইদুর অন্ধকারের মাঝেই দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। এক সময়ে ঝড়ের প্রকোপ আরো বাড়ল, অন্ধকার আরো ঘন হল, গাঢ়। ওবাইদুর ঘরে এসে ঢুকল। হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বাতি জ্বালল। ঘর আলোকিত হল। নজরে পড়ল দুপুরে কোটা ওলগুলো। এগুলো নিয়ে কি করবে সে? ওবাইদুর বাতিটা তাকে রাখল। ধুচুনিশুদ্ধু ওলগুলো একবারে নাড়াচাড়া করল, ভাবল, সাঁতলে নেবে তেলে। ভোর হলে বেঁধে নিয়ে ছুটবে মেয়ের বাড়ীতে। মেয়ে ভীষণ খুশি হবে। হবে না?

আবার ভাবল, তার চেয়ে সফিককে ডেকে দিয়ে দেবে সে। ডাক দিলে কি সফিক আসবে না? যদি না আসে। ওবাইদুর ক্ষণ কয় বিমর্ষ হয়ে বসেই রইল।

যখন উঠে দাঁড়াল তখন বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ভাবল, এ সুযোগে ওলগুলো ওদের বারান্দায় চুপি চুপি রেখে আসবে। যেই ভাবা অমনি ওবাইদুর ঘরে ঢুকে ওলের ধুচুনিটা তুলে নিল। বাইরে আসতেই চোখে পড়ল কে যেন ছুটে

ওঘরে ঢুকছে।

কে মুজিবুর, না শামসুর, না কি আমিনুর? ওবাইদুরের ইচ্ছে হল বকে দেবার। এমন ঝড়-জলে ভিজতে ভিজতে নবাবজাদা কোন রাজকাজে গিয়েছিল? না, ছেলেগুলোর একটাও মানুষ হল না। অথচ কত সাধ ছিল ওবাইদুরের, স্বপ্ন। লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। লোকে বলবে, ওবাইদুর রহমান আর কিছু না পারুক ছেলেগুলোকে মানুষ করেছে। ওবাইদুরের সে স্বপ্ন সার্থক হয় নি।

হঠাৎ কে একজন আবার ঝড়-জলে বেরিয়ে পড়ল। কে? সফিক, শামসুর, সাইফুর? ঠিক ঠাওর করতে পারল না।

এত ঝড়-জলে ওরা ছুটোছুটি করছে কেন? নুরুর মার কি চোখে পড়ছে না। এত ভিজলে শরীর খারাপ করবে যে। তখন এককাড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। ওবাইদুরের ইচ্ছে হল কষে বকে দেয়, বলে দেয় যে অসুখ বিসুখে ছারখার করে, এমন টাকা ওর নেই। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় ওবাইদুরের শীত করে উঠতেই মনে হল, এসব নিরর্থক ভাবনা। ছেলেরা আর কখনো ওর কাছে কিছুই চাইবে না। ওরা ওর হেফাজতের অনেক দূরে সরে গেছে। সব দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে তাকে। সে এখন একা।

ঝড়ের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। বৃষ্টির ছাঁটে বারান্দা ভিজে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরের লাগোয়া কাঁঠাল গাছের ডালে বাতাসের সে কী ঝাপটানি। ওবাইদুর ভাবল এ সুযোগে দিয়ে এলেই হয়। কেউ ত কোথাও নেই; চারিদিক অন্ধকার। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।

ওবাইদুর পা বাড়াতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল একটু হলে, বারান্দার খুঁটি ধরে কোন মতে বেঁচে গেল। আর ঠিক সে মুহূর্তেই ছুটে ঘরে ঢুকল যেন কে? আমিনুর, শামসুর, মুজিবুর?

ওবাইদুর খুঁটি ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় লুঙ্গির নীচের দিকটা একেবারে ভিজে গেল। একটি বাস সরকারী রাস্তা দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটে গেল শহরের দিকে। ওবাইদুর ভাবল এবার যায়। কিন্তু কে যেন বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। কে? বিদ্যুৎ চমকাতেই ঠাওর করে দেখার চেষ্টা করল। শামসুর। ডাকবে নাকি শামসুরকে? না থাক। সে নিজেই যাবে, রেখে দিয়ে আসবে চুপি চুপি। তারপর ওরা থাক না থাক ওবাইদুরের কি?

ওবাইদুর শামসুর ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শামসুর কি দাঁড়িয়েই থাকবে? ঘরে ঢুকবে না? ওবাইদুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। একি বাবা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে কি ও? ওকে দেখছে না ত। ওবাইদুর পায়ে পায়ে ঘরের ভেতরে এল। একটু পরে যাওয়া যাবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ ঘরে থাকা সম্ভব হল না ওবাইদুরের। বেরিয়ে এল বাইরে। খাইয়ের পাশের বাঁশবনে তখন তুমুল হৈ চৈ। কাঁঠাল গাছের ডালেও। ভীষণ ঝড় হচ্ছে, বৃষ্টি। ওবাইদুর বারান্দায় দাঁড়াল, অপেক্ষা করল একটি বিদ্যুৎ চমকের।

বিদ্যুৎ চমকাল। না, কেউ নেই। এ সুযোগে চুপি চুপি ওলগুলো রেখে আসবে ওবাইদুর। নুরুর মা দেখতে পেলে নিশ্চয়ই ফেলে দেবে না, রাঁধবে। যদি না রাঁধে, যদি ছুঁড়ে ফেলে দেয় উঠোনে?

দিলে দেবে, কি করতে পারবে ওবাইদুর। সংশয়ের মুখোমুখি হতেই আপনা থেকে স্থির হয়ে গেল সে। মাথার ওপরের ঝড়, বৃষ্টি বিদ্যুৎ কিছুই তার খেয়ালে রইল না। সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। নসিবে যা থাকে থাক, ওবাইদুর ভাবল, দিয়ে আসবেই। সে দ্রুত পা চালাল।

ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, অঝোর ঝরণ বৃষ্টি তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, আর ঝড় বৃষ্টি বজ্রের সম্মিলিত শব্দ তালা লাগিয়ে দিচ্ছে কানে।

ওবাইদুর পা চালাচ্ছে। উঠনের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল। কেউ কি বারান্দায় এসেছে? ঠাওর করার চেষ্টা করল, না কেউ নেই। আবার পা বাড়াতে যাবে, বিকট শব্দে কি যেন ভেঙে পড়ল শরীরের উপর। ইয়া আল্লা—

বাতি হাতে ছুটে বেরিয়ে এল ফুলজান। বাতি বাড়িয়ে দেখল সামনে। ঝড়ে কাঁঠাল গাছটা ভেঙে পড়েছে উঠোনের উপর। বিদ্যুৎ চমকাল। একী! থর থর কেঁপে উঠল ফুলজান। অ নুরু। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ইয়া আল্লা। বলে ঢলে পড়ল ফুলজান। বাতিটা পড়ে গেল হাত থেকে। ততক্ষণে ছেলেরা বেরিয়ে এসেছে।

আমিনুর বাতি হাতে লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। মুজিবর, শামসুর, সাইফুর, সফিকুর সবাই।

বাপজান!—পাঁচটি কণ্ঠস্বর হঠাৎ থমকে থেমে গেল।

কাঁঠাল গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়েছে ঘরের উপর। ঘরটা হেলে গেছে একেবারে। আর কাঁঠাল গাছের নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ওবাইদুর রহমান দপ্তরী, তেষট্টি বছরের শীর্ণ শরীরটা নিয়ে, একটা হাত সামনের দিকে বাড়ান। যেখানে হাতটা রয়েছে তার কিছু দূরে কাত হয়ে রয়েছে ধুচুনিটা, আরো দূরে ছড়িয়ে রয়েছে কোটা ওলগুলো।

তখনো ঝড়ের প্রকোপ প্রবল, অবিরাম ধারা বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ অন্ধকারকে চিড়ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে॥

স্বজনী/জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

জল আরো বাড়বে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। ফি বছর জল হয়। বাঁধ ভাঙে। নদী-নালা খাল-বিল ডোবে। এই-ই স্বাভাবিক। অবশ্য এবারে তোড় একটু বেশী, উঠোনও ডুবে গেল। এ শুক্রবার সন্ধ্যার কথা। রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই ঘুমলো। কে জানত সে ঘুমই কাল হবে!

রাত কতক্ষণ তা কেউ জানে না, প্রথমে দক্ষিণপাড়ার দিকে কান্নাকাটি, চেঁচামেচি, ঝুপঝাপ পতনের শব্দ শোনা গেল। পাখীর ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার। উত্তরপাড়ার লোক তখনো ঘুমে। পূব পাড়া উঁচু জমিতে, ওদিকে তখন নিঃসাড়। একটু পরেই পশ্চিম-পাড়ায় গেল গেল রব। মাঝরাত্তিরে শব্দের আওয়াজ প্রখর, তীক্ষ্ণ। তার উপর হাওয়ায় উৎপাত, বৃষ্টিরও। তবু কান্নার আওয়াজ, আর্ত মানুষের বীভৎস চীৎকার, মড়াকান্না সব মিলিয়ে ঝড় জলের মধ্যরাত্রি ছিঁড়ে তছনছ হয়ে গেল। ফলে উত্তরপাড়া জাগল, পূবপাড়াও। উত্তরপাড়ার ভাগ্য ভাল, জেগে উঠেই দেখল বারান্দা ডুবি ডুবি, জল এই ঢোকে কি সেই ঢোকে। বেরোও বেরোও। সেই চীৎকার, সেই মড়াকান্না, সেই পাখী-সমূহের আর্ত কলরব।

বেরোও বললেই বেরনো চলে না, চতুর্দিকে জল। কোথায় যাব গো!

সত্যিই ত। ডাঙা আর কোথায়? বিল থেকে পাঁচ হাত উঁচু উঠোন ডুবল, তার থেকে দেড় হাত উঁচু বারান্দা, তাও ডুবল। কোথায় যাবে? যাদের মাটির ঘর ওরা মরিয়া। বেরোতে হবেই। যেখানে খুশি যাও, ঘরের ভেতর আর নয়, দেয়াল ধ্বসল বলে। সুতরাং জলে পড়, নীচে মাটি আছে। কিন্তু সাপ খোপ?

মরণ! অত জলে সাপ থাকে না।

জোঁক?

প্রাণে বাঁচলে জোঁকে ভয় কি? থুতু দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে। তাছাড়া ভাসা জলে জোঁক থাকে না। নাম নাম নাম।

হুড়মুড় করে উঠোনে নামল।

আমার কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, আমার হাঁড়ি-মালসা?

ও ঘরে থাকুক।

বলতে না বলতেই উত্তরের দিকের দেয়াল ধ্বসল। ঝপাৎ।

কোমর জলে, বুক জলে যারা দাঁড়িয়েছিল দেয়াল ধ্বসার ফলে জলের ধাক্কায় এক ডুব দিয়ে উঠল। যারা পালাতে চেয়েছিল তাদের কেউ কেউ জলে ডুবল, কেউ কেউ জলের তলার মাটিও ছুঁয়ে এল।

গেল, গেল, আমার সব গেল। বাড়ীর কর্তার বিকট আর্তনাদ।

একটু পরে যে প্রাণও যাবে। গিন্নি বলল, ও গেছে যাক, এখন ত প্রাণে বাঁচি।

কোথায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাবে?

অন্ধকার রাত্তির। আকাশ অন্ধকার মেঘে, দশদিক অন্ধকার বৃষ্টিতে, সামনে পেছনে জল, জল, জলের শব্দ। পথ কোথায়? সেই অন্ধকারেই একজন অন্যজনের হাত ধরে ধরে এগোতে লাগল। সে কোন দিকে কেউ হিসেব করল না।

উত্তরপাড়া কুমোরপাড়া। দু'চার খানা মাটির ঘর। আর সবারই দরমার বেড়ার ওপরে শনের ছাউনি। জল বাড়তেই সবাই মাচায় চেপে বসল।

আগেই কাঁচা মাটির হাঁড়িকুঁড়ি গলেছে। শুকনো পোড়া হাঁড়ি-মালসা ভেসে গেছে জলে। ধরে নি, ধরতে চেষ্টা করে নি। রাখবে কোথায়? নিজে বাঁচে না, শঙ্করাকে ডাকে কোন পাগল!

সুপুরির বাখারী দিয়ে বানানো তক্তপোষে উঠে বসেছিল নিশিকান্ত, উমাশশী; আর ওদের চার মাসের গাভীন ছাগলটা। হ্যারিকেন জ্বলছে বেড়ায়। সেই আলোয় তিনটে প্রাণীকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনটি প্রাণী তাকিয়েছিল জলের দিকে। জল বাড়ছে।

উমাশশী বলল, বাঁশের খুঁটিটার আরেকটা গিঁট যে ডুবে গেল গো।

নিশিকান্ত বলল, হুঁ।

ছাগলটা মিঁই করে বার দুই চেঁচাল।

কি হবে? উমাশশীর গলা।

ভগবান জানে।

নিশিকান্ত গায়ে গতরে হলে কি হবে, ভীরুর এক শেষ। এতটুকু সাহস

নেই। অথচ গতর দেখলে কে ভাববে, এই লোকটা একটা আরশোলা দেখেও পালায়। পুরুষমানুষের চেহারায় জলজ্যান্ত একটা মেয়েমানুষ। সত্যি বিস্ময়।

উমাশশী বলল, কি হবে গো?

নিশিকান্ত দেখল বাঁশের খুঁটির আরো একটা গিঁট ডোবে ডোবে।

জল খুব জোরে বাড়ছে রে।

তা ত বাড়ছেই।

এত জল! এবার এমন হল কেন কে জানে? ইলেকটরী বাঁধ ভেঙেছে?

উমাশশী কোন জবাব দিল না। যেখানের বাঁধ ভাঙুক, যাই হোক, এখন কিছু করো। বাঁশের খুঁটির আরেকটা গিঁট ডুবল।

এখনো বসে আছ যে! উমাশশীর কণ্ঠস্বর রুক্ষ, চড়া।

কি করি?

উমাশশী এক ধাক্কা দিয়ে নিশিকান্তকে জলে ফেলে দিল। আচমকা ধাক্কায় একেবারে শুয়ে পড়ল জলে। যখন উঠল তখনো মুখে চোখে কাদা। বানের জলে মুখ ধুয়ে বলল, তুই ধাক্কা দিলি?

না, ঠেলে দিয়েছি। মরণ অমন পুরুষে। উমা মাচানের ওপর উঠে দাঁড়াল। কাপড়ের আঁচল কষে বাঁধল কোমরে। বেড়া থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে নামল জলে। ছাগলটা বার দুই ডাকল। উমাশশী বলল, দাঁড়া আসছি।

নিশিকান্ত উমার পিছুপিছু ঘর থেকে বেরোল। বাইরে বৃষ্টি, অন্ধকার। উমাশশী চালের বাখারী ধরে এদিক ওদিক তাকাল। কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। সবাই কি তাহলে চুপি চুপি পালিয়েছে? যাকগে যাক।

নিশিকান্তকে বলল, আমি বাতি ধরছি, উঠোনে নেমে কলার ভেলাটা নিয়ে এস, যাও। নিশিকান্ত নিঃশব্দে কোমর জলে নেমে গেল।

ভেলাটা নিশিই তৈরী করেছিল, দিন দুই আগে। জলের দিনে ও চাই-ই। রাস্তাঘাট ত তেমন নেই, জল হলেই হাঁটুর কাপড় মাথায় করতে হয়। তা পুরুষমানুষের তাতে চলে, কিন্তু মেয়েমানুষের?

নিশি ফি বর্ষাতেই ভেলা তৈরী করে। আগে করত বুড়ি মার জন্যে, এখন উমাশশীর। তাছাড়া বাজার হাটে যাওয়ার জন্যেও লাগে।

শুকনো রাস্তায় হাঁড়ির ঝুড়ি মাথায় যেতে ভয় হয়, এ ত ভিজে, জলে জলময়। বরং এ বেশ ভাল। ঝুড়িটা ভেলার ওপর বসিয়ে লগি ঠেলে চলে যাও

গাঁওখালির হাটে, নাগরগঞ্জে, বোয়ালীয়ার বাজারে। কুচ পরোয়া নেই।

জল ঠেলে ঠেলে নিশিকান্ত ভেলার কাছে এগিয়ে গেল। একবার হেঁকে বলল, বাতিটা তুলে ধর, দড়ি পাচ্ছি নে।

উমাশশী যতদূর সম্ভব বাতি দেখাল। জলের ছাটে, বাতাসে, শিখা কাঁপছে। কাছের জিনিষই ঠাওর হচ্ছে না ত অন্দূরে!

নিশিকান্ত ভয়ে ভয়ে হাতড়ে দড়ি পেল। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভেলায় চেপে বসতে পারল না, যদি সাপখোপ থাকে। নিশিকান্ত লগি খুঁজতে লাগল। কোথায় লগি?

হেঁকে বলল, লগিটা পাচ্ছি নারে।

কোথায় গেল?

বোধহয় ভেসে গেছে।

যাক, তুমি ভেলাটা নিয়ে এস।

অগত্যা নিশিকান্ত ভেলা নিয়ে জল ঠেলে ঠেলে বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়াল। উমাশশী হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, নিশি বলল, ওপরটা দেখ। সাপটাপ নাই ত?

তাও বটে। উমাশশী ঘুরে দাঁড়াল। তন্নতন্ন করে দেখা হল, কিছু নেই।

দক্ষিণপাড়ার দিকে আবার সোরগোল উঠল। কার যেন বাড়ী পড়ল। পাখী ডাকল, মানুষের কোলাহল, জল ঝড়ের শব্দ।

উমাশশী মাথা তুলে মাঠের দিকে তাকাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এমনি অন্ধকার। বৃষ্টির জন্যে আরও। হঠাৎ দূরে ঝাপসা আলো দেখা গেল।

উমাশশী এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দাওয়ার উপরে যখন এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন হাঁটু জল, এখন হাঁটু ছাড়িয়ে অনেক ওপরে। আরেকটু হলেই কোমর ছোঁবে। ছাগলটা ভেতর থেকে আর্ত চীৎকার করে উঠল।

উমাশশী—যাই—বলে এগোতে লাগল। ঘরে ঢুকে যা দেখল তাতেই চোখ মাথায়। মাচানের ওপরে একটি সাপ।

সাপ গো! সাপ!

নিশি অন্ধকার জল ঠেলে ঘরে ঢুকল। কৈ।

ঐ দেখো।

সাপটা ভয়ে একেবারে কোণার দিকে চলে গেছে।

নিশি বলল, শালার পরাণের ভয় নেই! কিচ্ছু করবে না।

উমাশশী বাতি নিয়ে এগিয়ে গেল দ্ব'পা, নিশির দিকে তাকিয়ে বলল, ছাগলটা নাও। নিশি পাঁজাকোলা করে ছাগলটাকে নিয়ে দরজার বাইরে গেল। আগেই গ্বছিয়ে রাখা প্বঁটলিটা নিয়ে পিছে পিছে বাইরে এল উমাশশী। আসতে আসতে পেছনে ফিরে তাকাল একবার। দেখল সাপটা গ্বঁজে থাকা ম্বখ তুলে দেখছ।

উমাশশী ভীষণ অবাক হল। ও-ও বোঝে! নয়ত ওভাবে তাকাবে কেন? নিশ্চয়ই ভয় হচ্ছে ওর।

উমাশশী আরেকবার তাকাল। সাপটা ফণা তুলে স্থির হয়ে আছে।

ঈশ্বর! উমাশশীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ভেলার ওপরে একপাশে নিশিকান্ত, মাঝখানে ছাগলটা, ওপাশে উমাশশী। হ্যারিকেনটা সামনে। দ্বজনের মাথায় দ্বটো টোকা। হ্যারিকেনের ওপরে ধরার জন্যে একটা কুলো। এসবই উমাশশীর আয়োজন। ভেলাটা ভাসছে। ভেসেই চলেছে। কিছ্বটা বাতাসে, কিছ্বটা জলের ঢেউয়ে।

কোনদিকে যাচ্ছে গো? নিশিকান্ত শ্বধল।

কি জানি!

এখন জল বাড়ছে কি না সে হিসেব করার উপায় নেই। ব্ষ্টির তোড় বেড়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বাতাসও জোরে বইছে। হাড়ে শ্বদ্ধ কাঁপ্বনি ধরছে। নিশিকান্ত জব্থব্ মেরে বসে আছে। উমাশশী বলল, একটা হাঁক দাও ত।

হাঁক দেব?

হ্যাঁ।

নিশিকান্ত প্রাণপণে একটা হাঁক দিল। তার কাঁপা স্বর বাতাসে আরো কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যেতেই চত্বর্দিকে থেকে অজস্র সাড়া পাওয়া গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল উমাশশী। হাঁফ ছাড়ল নিশিকান্ত।

না ওরা একা নয়।

কে একজন দ্বর থেকে কি যেন শ্বধল, নিশি বলল, আমি নিশি গো, কুমোরপাড়ার।

তুমি? নিশি শ্বধল।

মল্লবাড়ীর পীতাম্বর।

পীতাম্বর মল্ল। নিশি প্রমাদ গুনল মনে মনে। অত বড় লোকটাকে তুমি বলল নিশি।

এই দেখো! নিশি ভয়ে ভয়ে বলল, পীতাম্বরবাবুকে তুমি বললাম গো।

কি হয়েছে?

রাগ করবে না?

আগে জানে বাঁচুক, তারপরে রাগ।

নিশিকান্ত ভাবল, তাও ত বটে। কিন্তু যদি আবার হাঁক দেয়, যদি বলে, এদিকটায় আয়।

ঠিক যা ভেবেছে তাই। পীতাম্বর মল্ল হাঁকল, একটু দাঁড়া নিশি, আমরাও যাব।

কে দাঁড়াবে? লগি নেই, তদুপরি এই জল, ঝড়।

নিশি বলল, জলে নামি।

কেন?

ওই, দাঁড়াতে বলল যে।

বলুক গে।

রাগ করবে না?

মরণ মিনসের! শেষে জলের তলায় যাও আর কি।

ভেলা ভেসে চলেছে। পীতাম্বর মল্ল আরেকবার হাঁকল। সাড়া দিতে যাচ্ছিল নিশি, উমাশশী ধমক দিয়ে বলল, চুপ।

নিশি চুপ করে গেল।

উমাশশী বলল, লগি নাই গো, তোড়ে পড়েছি।

ব্যস্, সব চুপ।

অন্ধকার অন্ধকার। বৃষ্টির ঝাপট এখন একটু কম, বাতাসের দাপটও। বাজ বিজুলীও চমকাচ্ছে না যে বোঝা যাবে কোথায় এসেছে। নিশিকান্ত বলল, নিশ্চয়ই সাতগাঁ ছাড়িয়ে এসেছি।

হুঁ। উমাশশীর কণ্ঠস্বর।—আটগাঁয়ে পড়লুম।

উমি তথা উমাশশীর ঐ এক দোষ। নিশি কিছু বলেছে কি অমনি উমাশশীর গা জ্বালানো ফোড়ন। নিশি ভাবল, ভাগ্যদোষে এমন মেয়েমানুষের পাল্লায় গিয়ে পড়েছি, নইলে বাপ ত বলেছিল, শ্যামকাকার মেয়েটাকে বিয়ে করতে।

তা নিশিই করে নি, কেন না, মেয়েটা কেমন শুকনো শুকনো, গায়ে শুধু হাড়, আর গলায় মিঁউমিঁউ আওয়াজ। নিজে দেখেশুনে উর্মিকে বিয়ে করলে, যেমন গায়ে গতরে, তেমনি চলায় বলায়। তখন কি নিশি জানত, এ মেয়েমানুষ নয়, মেয়েমানুষের শরীরের নীচে হাড়কট্টর বেটাছেলে! এখন ঠেলা বুঝছে। হাড়মাস কালি করে ছেড়ে দিলে। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধি আছে। এই যে পীতাম্বরবাবুকে এককথায় চুপ করিয়ে দিলে। নইলে এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে কি না করতে হত!

নিশি উমাশশীর দিকে তাকাল। কি যেন ভাবছে।

ভেলার গতিবেগ সত্যই বেড়ে গেছে। উমাশশী টের পেয়েছে আগেই। নিশি তার পরে। যখন বাতি দিয়ে উমাশশী জল দেখছিল তখন।

কি হল গো। বেগ যেন বাড়ছে মনে লয়।

উমাশশীর সেই এক জবাব, হুঁ।

উমা ভাবছিল, ভোর হতে আর কতক্ষণ? নয়ত এমনি ভেসে ভেসে কোথায় যে চলে যাবে তার ঠিক কি! একবার কি যেন বলবার জন্যে মুখ তুলেছিল নিশির দিকে, নিশিও, উমাশশী কিন্তু কিছুই বলল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে উমাশশী বলল, বেশ ভয়ে ভয়েই এমনি ভেসে ভেসে কদ্দুর যাব?

তাই ত!

কিন্তু কি করবে অন্ধকারে নিশিকান্ত অথবা উমাশশী? কিই বা করবার আছে? উমাশশী এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। উমার মনে হল ওরা একটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে আবার মাঠে পড়ছে। ওর মনে হল, এখনি কোথাও ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে, সে গাছে হোক, ঝোপে হোক। এরপরে হয়ত সে পথও থাকবে না। কারণ জলের তোড় বাড়ছে, ভেলাটা ছুটছে যেন, উমা ভাবল, ময়ূরপঙ্খী নৌকা। হ্যাঁ তাই বটে! পাল নেই, ছই নেই, দাঁড়ি মাঝি কেউ নেই, তবু যেন উধ্বশ্বাসে ছুটছে। উমাশশী আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, ধর ধর।

ভেলাটা টাল খেল। আরেকটু হলেই পড়ছিল নিশিকান্ত। বেঁচে গেল।

কি ধরব? শুধল নিশি।

হাঁদা! মুখ বিকৃত হল উমাশশীর। বলল, হাঁদা নিয়ে হয়েছে আমার মরণ!

তা কি ধরব বলবে ত !

আমার মুণ্ডু !

নিশিকান্ত গুম হয়ে গেল। রাগে ফুলছে ভেতরে। একবার ইচ্ছে হল, দেবে নাকি এক ধাক্কা, তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে কত ঘাটে কত জল ! দামড়া মাগী ! মনে মনে গাল দিল উমাশশীকে।

এবার উমাশশীই হাত বাড়িয়ে একটা গাছের পাতা ডাল ধরল। ভেলাটা পলকে ঘুরে গেল। নিশিকান্ত হতভম্ব। পাতাডালটা আরো জোরে ধরতে যেতেই উমাশশীর মনে হল কি যেন নরম কিছু হাতের তলা দিয়ে হিড়হিড়িয়ে চলে গেল। মনে হল সাপ। উমাশশী ভয়ে ডালটা ছেড়ে দিল। এই যা !

উমাশশীর ইচ্ছে হল মাথা কোটে। এত ভয় না পেলেও তার চলত। সাপটা প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিল। তবু সে ডালটা ছাড়ল কেন ?

উমাশশীর ভীষণ রাগ হল নিশিকান্তের উপর। হুতোমের মতো বসে আছে ত বসেই আছে। একটু হাত পা নাড়াবে, তাও না। এমন মরদে কাজ কি ? মুখপোড়া !

উমাশশী অন্ধকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

এবার নিশিকান্তই ধরল। পাতা ডাল নয়, চারাগাছও নয়, প্রমাণ সাইজের গাছের গুঁড়ি ! জোরে ধাক্কা খেয়েছিল সবাই। উমাশশী আর ছাগলটা প্রায় গড়িয়ে যাচ্ছিল, বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল। অবশ্যই সে বুদ্ধি উমাশশীর।

ছাগলটাকে আগেই দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল ভেলার সাথে, উমাশশী সেটা ধরে ছিল। ইতিমধ্যে নিশি ভেলার দড়িটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। নিশ্চিন্ত। এত কিছু করা সত্ত্বেও উমাশশী এক বারের জন্যও খুসি হল না, বলল না, ভাগ্যিস ধরেছিলে গো ! চাই না উমাশশীর বলা। সে কী ওর তোয়াক্কা করে নাকি ?

উমাশশী মনে মনে খুশীই হয়েছে। কিন্তু নিশিকান্তকে তা বুঝতে দিল না। বাঁধলে ত, এখন ?

এখন কি ?

কি হবে ?

সে ভোর হোক দেখা যাবে।

নিশিকান্ত চেপে চুপে ভেলার ওপর বসল। এবার হোক বৃষ্টি, হোক ঝড়,

বাড়ুক জল।

উপরে আলোহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা আকাশ, গাছের ডাল, পাশে থৈ থৈ জল ; ভেলার উপরে দুটি মানুষ-মানুষী, একটি আবোলা প্রাণী। কোথাও আলো নেই, জন-মানুষেয় চিহ্ন নেই, শুধু জল জল, জলের শব্দ।

উমাশশী ক্রমান্বয় জলশব্দে উন্মনা হয়ে গেল।

যথারীতি কালরাত্রিও ভোর হয়। ভোর হল। মেঘলা ভোর। সে শনিবার সকালবেলার কথা।

নিশিকান্ত বলল, ভোর হল।

হুঁ। উমাশশী জবাব দিল।

এখন কি হবে ?

কি হবে ? উমাশশীও তাই ভাবছে। কি হবে ? যন্দুর চোখ যায় থৈ থৈ জল। জলে জলে একাকার। শুধু বড় বড় গাছের মাথা ছাড়া কিছু নেই। মানুষ-জন না, কাক-পক্ষীও নয়।

এ কোথায় ? দিকচিহ্নহীন কোন অকূলে ? উমাশশী মনে মনে ভাবল, এই ভোরের চাইতে রাত, অন্ধকার রাত্তির ছিল ভাল। উমাশশী ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ততক্ষণে কাঁপন ধরেছে তার গায়ে। মনে হচ্ছে আর আশা নেই, ভরসাও নয়। উমাশশী শেষ বারের মত নিশিকান্তের দিকে অপলক তাকাল।

কিগো, কিছু বলছ ?

উমাশশী বলল, না।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ছে। জলের দাপট, ঝড়ের দাপটও। এবং পোড়া পেট আর মানছে না। নিশিকান্ত খিদের তোড়ে ভেলার উপরই বারকয়েক নড়ে চড়ে বসল। বারকয়েক বলি বলি করেও উমাশশীকে কিছু বলতে পারল না। উমাশশী কি যেন ভাবছে।

কি ভাবছে উমি ? ভাবলে কি হবে ? তার চাইতে পুঁটলিটা খুলুক, গুছিয়ে বসুক ভেলার ওপর, জল ত আর চিরদিন থাকবে না। এ জল নিশ্চয়ই কমবে।

নিশিকান্ত উমাশশীর দিকে তাকাল।

ছাগলটা ইতি মধ্যে বার কয় চেঁচিয়েছে। উমাশশী প্রতিবারই হাত বুলিয়েছে গায়ে। এখন ছাগলটা জোরে জোরে চেঁচাচ্ছে। উমাশশী বুঝল, ক্ষিদে

পেয়েছে। নিশিকান্তকে বলল, গাছে চড়ে দুটো ডাল ভাঙ না।

কি হবে?

ছাগলটাকে দেব। উমাশশীর কণ্ঠস্বর ভীষণ নরম, নম্র।

এ যে হিজল গো!

তাতে কি?

হিজল পাতা ছাগলে খায় না।

খিদের মুখে সবই খায়। পেড়ে দাও না গো!

এ উমাশশীর অন্যায় আব্দার। নিশির পেটে কোথায় ছুঁচো ডন দিচ্ছে, সে রইল পড়ে, ছাগলের জন্যে চিন্তাই বেশী।

পারব নি।

কেন? উমাশশী ফেটে পড়ল।

না, পারব নি।

উমাশশী এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ভেলা দুলল, নিশি টলল। সত্যি বলতে কি একটু ভয়ই পেল। ভয়ে ভয়েই নিশি বলল, পাড়ছি।

নিশি গাছে উঠল, পাতা ডাল ভেঙে কিছু নীচে ফেলল। এবং গাছের মাথায় চড়ে দেখল যন্দুর চোখ যায় জল আর জল। নিশিকান্ত উপর থেকেই বলল, ডাঙার কোন নিশানা নাই গো।

মানুষ-জন?

আরে কাক-পক্ষী নেই ত, মানুষ!

উমাশশী ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল। গাছের মাথা থেকে চোখ নামাল নিশিকান্ত। শুধল, কি হল?

উমাশশীর কান্না আরো বেড়ে গেল।

তর তর করে গাছ থেকে নেমে এল নিশিকান্ত। দেখল হিজল পাতায় মুখও দিচ্ছে না ছাগলটা। আর উমাশশী ছাগলটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মেয়েমানুষ আর কারে কয়! মনে মনে বলল নিশিকান্ত। মুখে বলল বলেছিলাম ত খাবে নি। তবু উমাশশীর কান্না বন্ধ হল না।

উমাশশী ভাবছিল, যদি তাড়াতাড়ি জল না কমে তাহলে কি হবে?

খিদের জ্বালা বাড়ছিল নিশিকান্তর। নিশির পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কোথায় সেই ভোরের একথালা পান্তা গেলা, তা না একমুঠো চিড়েমুড়িও জুটল না এখনো। নিশি বলল, পুঁটলীটা খোল না উমি।

কেন ?

একমুঠো চিড়ে দে, পেট গুলোচ্ছে।

গুলাক।

গুলাক! উমাশশীর কথায় একেবারে বোবা হয়ে গেল নিশিকান্ত। তাজ্জব মেয়েমানুষ! খিদের সময় খাবার দিবি না, তবে পুঁটলী বেঁধে আনা কেন? নিশিকান্তর চোখ ক্রমে কুটিল, ক্রমে সন্দেহজনক হয়ে উঠল। সে উমার দিকে তাকাল, যেন শত্রু।

উমাশশী ভাবছিল তার ভুলো মনের কথা। কি করে যে চিড়ে-মুড়ির পুঁটলীটা ফেলে এল সে ভাবতে পারছে না। সেটা ত দরজার উপরেরই টাঙান ছিল। এমন করে নজর এড়াল কি করে? এখন কি জবাব দেবে মানুষটাকে। অত বড় শরীর, পুরো না হোক সিকি খোরাক ত চাই। উমাশশী নিশিকান্তর দিকে চোখ ফেরাল।

ওকি!

নিশিকান্তর চোখ জোড়া লাল হয়ে গেছে জবা ফুলের মতো, শরীর কাঁপছে থরথর করে, মনে হচ্ছে এখুনি একটা প্রলয় ঘটল বলে।

উমাশশী ছাগলটার আড়ালে সরে গেল সন্তর্পণে।

নিশিকান্ত বলল, পুঁটলী দে উমি। গলার স্বরে ঝড়ো মেঘের আওয়াজ। চিড়ের পুঁটলী ভুলে ফেলে এসেছি গো। উমাশশীর ভীরু অনুচ্চ কণ্ঠস্বর। কি? বজ্রপাতের শব্দ হল নিশিকান্তের কণ্ঠে। তবে ও পুঁটলী কিসের? উমাশশী দ্রুত পুঁটলীর মুখ খুলে দিল। একরাশ মিয়োন কাঁঠাল পাতা। নিশিকান্ত রাগে ক্ষোভে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। তার কাছে মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল। তার মনে হল সম্মুখের এই বিশাল জলরাশি জল নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু। সে ভাবল, কি লাভ এখানে বসে থেকে। কি সুখ উমির মুখে চোখ রেখে। তার চেয়ে সে চলে যাবে। ভেসে যাবে জলের তোড়ে। কূল পায় ভাল, নতুবা অকূলে সে হারিয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলেও সে বাঁচবে না, ভেসে গেলেও সে মরবে। তিলে তিলে মরার চাইতে সেই-ই ভাল। নিশিকান্ত উঠে দাঁড়াল।

উমাশশী অপলক তাকিয়ে আছে নিশিকান্তর দিকে। নিশিকান্তর চোখ জলে।

পলক ফেলবার আগেই নিশিকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

সে কী ?   উমাশশী উঠে দাঁড়াল।

এই, এই, ফির, ফির, এই—

নিশিকান্ত ডুব দিল।

অপলক তাকিয়ে আছে উমাশশী। স্পষ্টই দেখছে মানুষটা গা ভাসিয়ে দিয়েছে জলে, ক্রমে দূর থেকে আরো দূরে চলে যাচ্ছে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে শরীর মাথা।

উমাশশী কাঁদল না, মাথা কুটল না, চুল ছিঁড়ল না, চেঁচালও না। সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। এক সময়ে চোখটা ফিরিয়ে নিল। দেখল ছাগলটা, চার মাসের গাভীন ছাগলটা মিয়নো কাঁঠাল পাতা চিবুচ্ছে এলোপাথাড়ি। গিলছে, ছড়াচ্ছে, ছিটোচ্ছে।

জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি স্থির দাঁড়িয়ে এক বন্ধ্যা নারী, আরেক গর্ভিণী রমণীর খাওয়া দেখছে অপলক। উপরের আকাশে তখনো অগাধ মেঘ, নীচের পৃথিবীতে তখনো অনেক জল। উমাশশী ভাবছে, মাস দুই পরেই ও বিয়োবে॥

দর্পণ/আশ্বিন ১৩৭১

সুধন্য ও সেবারের বর্ষা সমাপ্ত

চিত্ত সিংহ

প্রণীত

উপন্যাস প্রসঙ্গে



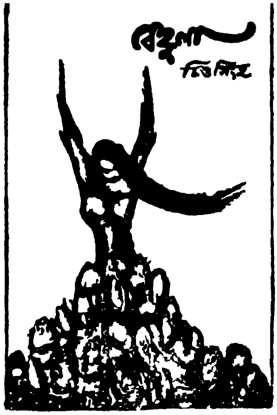
"ইতিপূর্বে লেখকের 'ঈশ্বর পাটনী' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম : 'আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে চিত্ত সিংহ একটি নতুন কণ্ঠস্বর, একটি নতুন প্রত্যয়। আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠ করবার পর তাঁর সম্পর্কে আমাদের এই অভিমত সুদৃঢ় হলো। আধুনিক যুগের জটিল জীবন বিন্যাস উপন্যাসে ঠিক কিভাবে বিধৃত হওয়া উচিত তারই একটা ভাস্বর দৃষ্টান্ত 'নতজানু'।······

···মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান লক্ষণই হলো সত্যান্বেষণ—একথা গ্যেটে থেকে টলস্টয় সবাই বলে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ও বলেছেন। চিত্ত সিংহ এঁদের অনুসারী লেখক। বর্ণবিহীন বর্তমান বাংলা কথা সাহিত্যে যখন আকালের যুগ চলছে তখন এইরকম একটি উপন্যাসের প্রকাশ স্বভাবতই অভিনন্দন যোগ্য।···

আপনার সাম্প্রতিকতম উপন্যাসটি পড়ে মনে আসে ভূমিগ্রাসিত রথের চাকার পাশে নতজানু কর্ণের ছবি। জন্মসূত্রে হৃতমান, নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর মর্যাদার যুদ্ধে শ্রান্ত, বিষণ্ণ যন্ত্রণার এক আধুনিকতম প্রকাশ ঘটেছে আপনার 'নতজানু' উপন্যাসটিতে—আমার এ কথাই মনে হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, আমি বলতে চাইছি আপনি কর্ণকে ভেবেই ছাঁচটা গড়েছেন।······

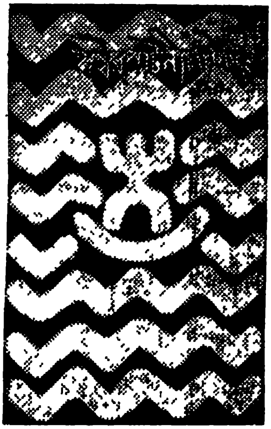
···আদপে কেউ-ই বোধহয় মূলচরিত্র নয়—'নতজানু' মানুষের যুগান্তব্যাপী যন্ত্রণার সামগ্রিক দলিল।······

একটি চিঠি/কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়



…বাঙলা লোকায়তকে উপন্যাসে বাঁধবার যে জমি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন 'ঈশ্বর পাটনী'তে, 'বেহুলা'য় এসে তা ফসল-সম্ভব হয়েছে।…বেহুলা' প্রতিটি অধ্যায়েব উত্তরণে ক্রমশ নির্দিষ্ট কাহিনী ও সে-সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার পর্যায় থেকে প্রতীকী হয়ে উঠেছে। ফলে যুক্ত হয়েছে একটির পর একটি মাত্রা শেষে অকূল জলবাশিও বিপুল মানব-প্রজন্মের মতোই তা ফ্রেম ভেঙে অনির্দেশ্যের দিকে বেবিয়ে পড়েছে।… এখানে এসে বেহুলা শুধু সায়বেনের ঝি নয, লখীন্দরের স্ত্রী বা তাব সন্তান-সম্ভবা নয়, আগামী দিনের বিশ্বজোড়া সন্তান-সন্ততির সৃষ্টিরূপিনী। চিরকালের নাগালের বাইরে থেকে যাওয়া এই শীর্ষবিন্দুকে 'বেহুলা'য় ছুঁতে চেয়েছেন চিত্ত, তাঁর জয়-পরাজয় সব কিছু এই প্রয়াসের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চিহ্নিত।……

…এই বেহুলায় সমাজ নেই, আবহমান কালের সামাজিক উদ্ঘাটন নেই, ঐতিহাসিক স্পন্দন নেই। তবে কি আছে? মাপ করবেন, প্রথমবার পড়ার শেষে আমি ভয়ঙ্কর বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম।……পরদিন ঘটনাচক্রে ছিল ছুটির দিন। সকালেই দ্বিতীয়বার 'বেহুলা' নিয়ে পড়লাম। কোন উপায় নেই। আপনার 'বেহুলা'য় আমার বেহুলা সম্পর্কে সমস্ত পুরোনো ধারনা এবং সংস্কার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এবং ১৯৭৭ এর একজন লেখকের কাছে সেটাই প্রত্যাশিত। দ্বিতীয়বারে সমগ্র মেধা এবং বোধ দিয়ে বুঝতে পারলুম, বেহুলার রূপকে আপনি আমাদের জীবনের চরম নিয়তির কথাই বলতে চেয়েছেন—বলতে চেয়েছেন সংহারের মুখোমুখি সংগ্রাম এবং ভালোবাসাই রক্তমাংসের মানুষের জীবন কাহিনী। এবং মৃত্যুর হাতের মুঠোর মধ্যেও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারাই জীবন ধর্ম। ফলে, বেহুলাকে বলতেই হয়, 'আমি ফিরেছিলাম, জলজ্যান্ত জীবন নিয়েই ফিরেছিলাম'।… …





বিশ্ববিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক আরস্কিন কল্ডওয়েলের চিঠি ঃ

Dear Sirs,

I have read the novel <u>Iswar Patni</u> by Chitta Sinha and found it to be an unusually interesting work of fiction. I find that I have been impressed so much that the story leaves me with the implication that it itself is a legend of long ago. And I, for one, consider the story to be universal in its meaning and could have happened anywhere in the world other than in India.

Sincerely,

Erskine Caldwell

প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী ঃ

…'ঈশ্বর পাটনী' চমৎকার বই হয়েছে। অসাধারণ বই হয়েছে। অনেককাল বাংলা ভাষায় এত ভাল বই পড়ার সুযোগ ঘটেনি। যতক্ষণ বইখানা পড়ছিলুম, বইয়ের ভাবজগতে তন্ময় হয়েছিলুম। …অনির্বচনীয় কাব্যগুণে বইখানা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীলতার রূপ পেয়েছে।…

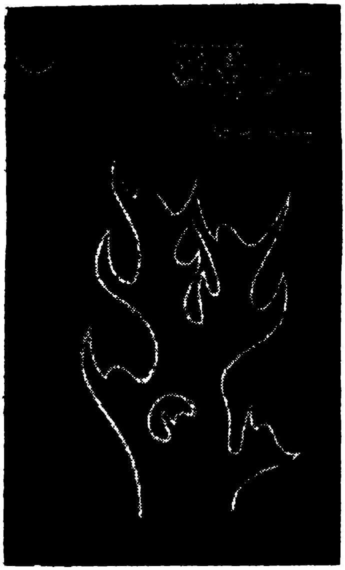
…'ঈশ্বরী পাটনী' গ্রন্থ রচনার জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমার লেখনীর বাড়বাড়ন্ত হোক।…

ISWAR PATNI Translated from Bengali by ANADI

…In a word, the novel is a masterpiece.

Amrita Bazar Patrika 8. 1. 78

…"this book is a distinct addition in the realm of literary translation trying to capture the very sprit of medieval Bengal in the well known saga of eternal conflict of Goldlines and Goodliness".

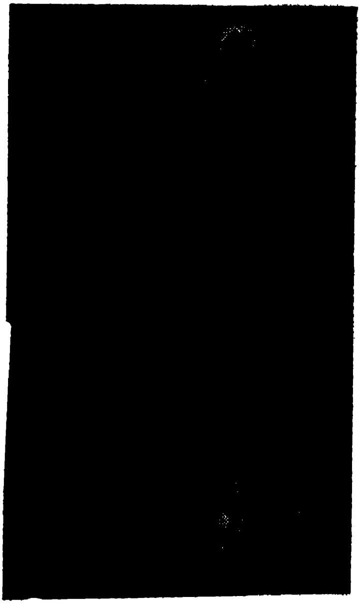


"জতুগৃহ" বাংলাভাষার মেধাসম্পন্ন পাঠককে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সামনে পৌঁছে দেবে। গ্রন্থের সাংকেতিক কাহিনীর বিষয় মহাভারতের সেই পর্ব, যেখানে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী কৌরবকুলের ষড়যন্ত্রে আশ্রয় নিয়েছেন বারণাবত মহানগরীতে। পরবাসী সেই পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের অন্তে এই গ্রন্থের সমাপ্তি। বিষয় এই, কিন্তু লেখক নিজস্ব মানসিক গভীরতা দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক আলোকে বিশ্লেষণ করে ঘটনাবলীকে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞানে পৌঁছে দিয়েছেন।......

...সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য রচনার ধারার দিক থেকে, বিষয়বস্তুর চিরকালীন বোধকে মেধায় রেখে, এই উপন্যাস, এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম, যা স্মরণ থাকবে বহুকাল।

..."বহুলাঞ্ছিত এই সভ্যতার সারাৎসারকে একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের ভেতরে ধরার বয়স্ক প্রয়াস ফুটে উঠেছে 'জতুগৃহ' উপন্যাসে। মহাভারতীয় পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুরুদূত পুরোচন এই উপন্যাসে শুধু কয়েকটি চরিত্র হিসেবে পদপাত করেনি, তাঁরা মানুষের বিভিন্ন অন্তর্মুখী ভাবনা, রিপু ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন এখানে।...

..."আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম কাকে সিরিয়াস লেখা বলে। ১৯৫৫ সালে সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' বেরয়, বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' বেরয় ১৯৫৫ সালে। 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধ ; মহাভারতকে কেন্দ্র করে নতুন ভিত রচনা করেছেন বুদ্ধদেব 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' 'অনাম্নী অঙ্গনা' প্রভৃতি নাটকে। এগুলি যেহেতু গদ্য, কাব্যনাট্যে বিবৃত, সেই হেতু নিছক গদ্য হিসেবে এদের গণ্য করতে পারি না। চিত্ত সিংহ দীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধানে প্রথম দুঃসাহসিকভাবে একালের সিরিয়াস, ধ্বনিময়, অর্থযুক্ত ব্যঞ্জনাদিগ্ধ, কালের কথ্যভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও যুগের চেতনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যুগোপযোগী গদ্য তৈরী করলেন। এ গদ্যের পূর্বসূরী হিসাবে রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেবকে ধরতে পারি।...... বার্ণিক রায়



"উপনিষদের প্রাণতত্ত্ব, যার সঙ্গে গতিবাদ ও মৃত্যু-অমৃতের সন্ধানী চেতনা ওতঃপ্রোত, আধুনিক মননকে বারে বারে ও নানাভাবে আন্দোলিত করেছে, বিচিত্র শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। ...সম্প্রতিকালের তরুণ লেখকদের অনেকেও উপনিষদের এই রহস্যময়ী উপলব্ধিকে স্বচেতনায় গ্রহণ, এবং সমসাময়িক জীবন দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। চিত্ত সিংহের 'নিষাদ' এই চেতনায় উজ্জীবিত একটি সাংকেতিক উপন্যাস।......বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে জীবনের ক্রম অভিসার, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃতোপম এক লোকাতীতের দিকে আত্মার নিরবধি যাত্রা। ...ষড়রিপু-বিস্ময়-মৃত্যুচেতনা-ভয়-সময়চেতনা ইত্যাদি বৃত্তির স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আত্মা এগিয়ে চলে অন্ধকার থেকে আলোয়, আবার অন্ধকারে, তারপর শেষ জ্যোতির্ময় আলোক সত্যে। চলার পথে পথে নিহত হতে থাকে রিপু, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি : আত্মা তাই ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে নিষাদ-রূপে পরিচিত। সেই নিষাদ-আত্মার সাংকেতিক রূপায়ণ 'নিষাদ' উপন্যাস।...মানবাত্মার এতাদৃশ অভিযাত্রার ব্যঞ্জনা বার্নার্ড শ'-র 'অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ব্ল্যাক গার্ল ইন হার সার্চ ফর গড' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'-এ আছে। শ্রী সিংহের বর্ণনারীতি এ দুটো থেকেই স্বতন্ত্র।"......